গল্প
সল্প

শেষ পর্যন্ত

কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়
এফই- ৩৭৭

খেলা শুরু প্রথম রাউন্ড

''রোল নম্বর ওয়ান?''

''ইয়েস স্যার।''

''টু।''

''ইয়েস স্যার।''

''রোল নম্বর থ্রি?''

''আসেনি স্যার।''

''রোল নম্বর ফোর?''

''ইয়েস স্যার।''

''রোল নম্বর ফাইভ?''

''ইয়েস স্যার...''।

বাংলার মাষ্টারমশাই রোল কল করে হাজিরার খাতা গুটিয়ে রেখে পড়া ধরতে বসলেন। পড়াটা গতকাল বলে দিয়েছিলেন। আজ মুখস্থ ধরবেন। ছেলেরা জানে কিভাবে পড়া ধরেন। রোল নম্বর এক থেকে শুরু হবে। দু লাইন করে মুখস্থ বলতে হবে। অরিন্দম জানে ওকে কোন দুলাইন বলতে হবে। হিসেব করে লাইন দুটো ঝারাঝাপটা মুখ স্থ করে রেখেছে। কিন্তু টেনশন শুরু হয়ে গেছে একটাই কারণে। রোল নম্বর থ্রি অখিলেশ আসেনি। অখিলেশ কোনদিন কামাই করেনা। আজ কামাই করে হিসেব সব গোলমাল করে দিয়েছে। মনে মনে দ্রুত নতুন হিসেব করার চেষ্টা করছে অরিন্দম। তারমানে ওকে যে লাইনগুলো বলতে হবে...।

মাষ্টারমশাই বেতটা হাতে নিয়ে বললেন, ''রোল নম্বর ওয়ান, শুরু কর।'' অজয় প্রস্তুত হয়েই ছিল। উঠে দাঁড়িয়ে টানটান হযে ঝরঝর করে বলতে আরম্ভ করল ''আমাদের ছোটো নদী চলে বাঁকে বাঁকে

বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে।''

''বেশ, রোল নম্বর টু।''

''পার হয়ে যায় গোরু, পার হয় গাড়ি,

দুই ধার উঁচু তার, ঢালু তার পাড়ি।''

''তারপর, রোল নম্বর থ্রি, বলে যা, বলে যা।''

''অখিলেশ আসেনি স্যার,'' পেছনের বেঞ্চ থেকে কেউ একজন বলল।

এক্ষুনি রোল কল করেছিলেন মাষ্টারমশাই। কিন্তু খেয়াল নেই। নির্লিপ্ত যান্ত্রিক গলায় বললেন, ''রোল নম্বর ফোর, পরের লাইনগুলো বল।''

অনির্বাণ উঠে দাঁড়াল। হাতের চেটো দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে বলতে শুরু করল,

''চিক্ চিক্ করে বালি, কোথা নাই কাদা,

একধারে কাশবন ফুলে ফুলে সাদা।''

''বেশ, তারপর... রোল নম্বর ফাইভ... বল।''

ভেতরটা কিরকম ধুকপুক করছে অরিন্দমের। উঠে দাঁড়ানারে পর পা টলটল করছে। সব কিরকম গুলিয়ে যাচ্ছে। একটা ঢোঁক গিলে বলতে শুরু করল,

''কিচিমিচি করে সেথা শালিকের ঝাঁক''

অরিন্দম চুপ করে গেল। মনে পড়ছে না। পরের লাইনগুলো কিছুতেই মনে পড়ছে না। মাষ্টারমশাই চোখ পাকিয়ে বললেন, ''কী হলো?''

মনে পড়ছে না। আপ্রাণ চেষ্টা করেও কিছুতেই মনে পড়ছে না। মাষ্টারমশাই বেত উঁচিয়ে বললেন, ''মুখস্থ করিসনি? খালি ফাঁকিবাজি।''

মরিয়া হয়ে অরিন্দম বলল, ''আমবন তালবন... '' তারপর সব কেমন তালগোল পাকিয়ে গেল। অরিন্দম জানে এরপর শাস্তি কী! ডান হাতের চেটোটা মেলে ধরল। চোখটা পড়ে গেল অনির্বাণের দিকে। অনির্বাণের চোখটা কিরকম উল্লাসে চিকচিক করছে।

রাউন্ড সতেরো

হুইসেল বাজল। একবুক দম ধরে রেখছিল অরিন্দম। হুইসেল বাজতেই ছিটকে বেরল মাঠের ওপর খড়ি টানা দাগটা থেকে। মাত্র একশ মিটার। হারাতেই হবে অনির্বাণকে। জীবনে এই একটাই লক্ষ্য। অনির্বাণকে হারাতেই হবে। কিছুতেই সেটা যে হয়না। সেই কোন ছোট ক্লাস থেকে চেষ্টা করছে। এখন ক্লাস এইট। অনির্বাণ ফার্স্ট, সেকেন্ড হয়না, কিন্ত বার্ষিক পরীক্ষায় ঠিক অরিন্দমের থেকে দু এক নম্বর বেশি পেয়ে যায় ছেলেটা।

প্রাণপনে দৌড়চ্ছে অরিন্দম। চারদিক থেকে চিৎকারের আওয়াজ ভেসে আসছে। কিন্তু কোনও আওয়াজই কানে ঢুকছে না। দেবনাথ স্যার দৌড় প্র্যাকটিস করানারে সময় বারবার বলে দিয়েছিলেন দৌড়ানারে সময় কোনদিকে না তাকাতে। লক্ষ্য হবে একটাই। ফিনিশিং লাইনের ফিতে। অরিন্দমের সামনে সৈকত, বিপুল, নিরঞ্জন। তাতে কী? আসল ছেলেটাতো এখনো পেছনে। আর মাত্র একটুখানি। অরিন্দমের মনে হচ্ছে পাখির মত উড়ে ঠিক পৌঁছে যাবে আসল লক্ষ্যকে পেছনে ফেলে।

ফিতেটা ছিঁড়ে এগিয়ে গেল সৈকত, বিপুল, নিরঞ্জন। ব্যাস আর কয়েক হাত। আচমকা কি যে হলো! পা পিছলে গেল। লুটিয়ে পড়ল অরিন্দম। বিচ্ছিরিভাবে মচকে গেলো পা-টা। যন্ত্রনায় কাতরাতে কাতরাতে কোনরকমে মুখটা তুলল। ফিনিশিং লাইনের ওপারে দুটো হাঁটু ধরে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে খাবি খেতে খেতে ওকে দেখছে অনির্বাণ। চোখে অদ্ভুত একটা চাহনি। ভিকট্রি স্ট্যান্ডে উঠে মেডেল না পেলেও ওকে আবার হারিয়ে দিল ছেলেটা। এবারেও হলো না। চারদিক কেমন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে অরিন্দমের।

রাউন্ড ছাব্বিশ

বাজার থেকে ফিরে বাবা বলল, ''জয়েন্টের রেজাল্ট দেখেছিস?''

অরিন্দম মাথাটা নীচু করল। রেজাল্ট অনেকক্ষণ আগেই জানা হয়ে গেছে। বাবাকে বলে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কিছুতেই বলতে পারেনি যে ডাক্তারির ভর্তি পরীক্ষায় নাম ওঠেনি। শুধু ডাক্তারি, কেন, ডাক্তারি ইঞ্জিনিয়ারিং কোনও পরীক্ষাতেই নাম ওঠেনি। বাবার একবুক স্বপ্ন ছিল ছেলে ডাক্তার হবে। শুধু স্বপ্ন বললে ভুল হবে স্থির বিশ্বাস ছিল ছেলে জয়েন্টে চান্স পাবেই।

ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে লম্বা শ্বাস ফেলল বাবা। বাজার থেকে ফিরে থলি নামিয়ে বাবা জামাটা খুলে দিয়ে ফ্যানের তলায় বসে। রেগুলেটরটা তিন পয়েন্টে রাখে। আজ ফুল স্পিড করে দিল। অন্যদিনের মত খবরের কাগজটা আর টেনে নিলনা। উদাস হয়ে পাখার দিকে চেয়ে থাকল।

এইসময় মা চায়ের কাপ নিয়ে ঢোকে। আজও এলো। বাবাকে ওইভাবে বসে থাকতে দেখে বলল, ''কী গো; শরীর খারাপ নাকি?''

লম্বা একটা শ্বাস ছেড়ে বাবা বলল, ''অনাদিবাবুর ছেলেটা ইঞ্জিনিয়ারিং-এ চান্স পেয়ে গেল। ছেলেটার এবার জীবনটা দাঁড়িয়ে যাবে।''

বুকের ভেতরটা তোলপাড় হতে আরম্ভ করল অরিন্দমের। মনে হচ্ছে চারদিকে ভূমিকম্প হয়ে সব কিছু ভেঙে পড়ছে। অনির্বাণ বহু বহু যোজন দূরে আলারে গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। আর কোনদিন ধরতে পারবে না ওকে।

রাউন্ড তেত্রিশ

সানাইটা এইমাত্র বন্ধ হলো। ক্যাটারারের লোকেরা বাসন গোছাচ্ছে। ঝনঝন্ আওয়াজ হচ্ছে। সানাইয়ের আওয়াজের চেয়ে এই ভাঙা রাতের আওয়াজটা বোধহয় ভাল। অরিন্দম বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে। শোয়ার ঘরের লাগায়ো এক চিলতে বারান্দা। গোটা বাড়িতে ছাদ থেকে ঝোলানো রয়েছে ঝিকমিকে আলো। তবু এই বারান্দায় কেমন যেন একটা ঘুপচি অন্ধকার নিজের জায়গা করে নিয়েছে। আর সেটা যেন অরিন্দমের জন্যই।

ঘরের মধ্যে খাটটা ফুল দিয়ে সাজানো। মঞ্জরী

গয়নাগাটি খুলছে। এরপর বেনারসীটা ছেড়ে রাতের পাশোক পরবে। এই সময়টার জন্য কত অধীর মুহূর্ত অপেক্ষা করেছিল অরিন্দম। বিয়েটা সম্বন্ধ করে। একে অন্যকে প্রায় চেনেই না। নতুন জীবনটা শুরু হতে চলেছে প্রবল রোমাঞ্চ নিয়ে।

ফুলশয্যার ঘরের দরজার ছিটকিনিটা তুলে দেওয়ার পর মঞ্জরী কানের কাছে মুখটা এনে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করেছিল, ''ফুলশয্যার শাড়িটা পরতেই হবে?

''মানে?''

''আস্তে। দরজার বাইরে সব আড়ি পেতে বসে আছে। আচ্ছা, এখন আর শাড়ি না পরে নাইটি পরতে পারিনা?''

অবাক গলায় অরিন্দম বলেছিল, ''পরো। যা তোমার ইচ্ছে। চেঞ্জ করে নাও। আমি বারান্দায় যাচ্ছি।'' অরিন্দমের হাতটা আলতো করে ধরে মঞ্জরী বলেছিল, ''বসো না একটু। কথা বলি।''

বাইরে তখনো সানাই বাজছে। মঞ্জরীর গলাটা কি সুরেলা। একেবারে সানাইয়ের সুরে মিশে যাচ্ছে। শব্দে যে ওম আছে এর আগে কোনদিন বোঝেনি। অথচ সেই ওমই... এ কথা ওকথার ফাঁকে খাটে গা এলিয়ে মঞ্জরী জিজ্ঞেস করল, ''আচ্ছা, ওই যে স্ট্রাইপড় নীল সুট পরে ছেলেটা এসেছিল, তোমাদের কে হয় গো?''

সাড়ে চারশ'র ওপর লোক নেমন্তন্ন করেছিল বাবা। যারা এসেছিলেন প্রত্যেকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছে মঞ্জরীর। কিন্তু এক সন্ধেতে এতজনকে মনে রাখতে না পারাটাই স্বাভাবিক। শীতকালে অনেকেই সুট

পরে এসেছিল। - ''কোন নীল সুট বলোতো?''

''আরে সুটের পকেটে একটা লাল রুমাল ছিল...''

''ও বুঝেছি। অনির্বাণ,'' এই প্রথম অরিন্দমের মনে হয়েছিল, অনির্বাণকে হারিয়ে দিতে পেরেছে। অরিন্দমের মঞ্জরীর মত সুন্দরী বউ নেই। যদিও অনির্বাণের এখনো বিয়ে হয়নি, কিন্তু অরিন্দম খেয়াল করেছে। অনির্বাণ বারবার মঞ্জরীকে দেখ ছিল। নিশ্চয়ই মনে মনে অনেকবার 'ইস' বলেছে।

''আমার স্কুলের বন্ধু অনির্বাণ। এই পাড়াতেই থাকে। কেন বলতো?'' কানের দুল খুলতে খুলতে একটু ইতস্তত করে মঞ্জরী বলেছিল, ''আমাকে দেখতে এসেছিল। ''মানে?'' ''মানে তুমি যেমন দেখতে এসেছিলে। বিয়ের সম্বন্ধ। পাত্রী দেখতে এসেছিল।'' বিস্ফারিত চোখে অরিন্দম জানতে চেয়েছিল, ''তারপর?''

''পছন্দ হয়নি আমাকে। ভালই হয়েছে বলো। নাহলে কি তোমাকে পেতাম?''

মঞ্জরী ঘনিষ্ঠ হয়ে আসার চেষ্টা করছিল কি? অরিন্দম ছিটকে উঠে বারান্দায় চলে এসেছিল। আর ঠিক তক্ষুণি বাইরে সানাইটা কেউ বন্ধ করে দিয়েছিল।

শেষ রাউন্ড

অরিন্দম বৃদ্ধ হয়েছে। অনির্বাণও বৃদ্ধ হয়ছে। সংসার যাপন করতে করতে আরো কত রাউন্ড যে অরিন্দম অনির্বাণের কাছে হেরে গেছে তার আজ আর হিসেব নেই। কারণ অনির্বাণ বিদেশে চলে গিয়েছিল। বাবা মা মারা যাওয়ার পর বাড়িটাও বিক্রি করে দিয়েছিল। আর কোনও যোগাযোগ ছিলনা। তবু অরিন্দমের নিঘুম রাত্রে মাঝে মাঝে মনে হতো নিয়তি প্রতিদিন একবার কোথাও না কোথাও অনির্বাণকে জিতিয়ে দিচ্ছে। জীবন তবু দুজনকে আচমকা আরেকবার মুখোমুখি করে দিল, হয়ত এটাই শেষ রাউন্ড।

''অরিন্দম তুই এখানে?''

''আরে আমিও তো তোকে এই প্রশ্নটাই করছি। আয় বাসে।''

কিছুক্ষণ আগে সূর্য অস্ত গেছে। শহরের ধোঁয়া মাখা গোধূলি আকাশের নিচে বৃদ্ধাবাসের এক চিলতে বাগানে বেতের চেয়ারে মুখামুখি দুই আবাল্য বন্ধু বৃদ্ধ। অনির্বাণের পুরু চশমার কাঁচে অদ্ভুত এক ময়ূরপঙ্খী ছটা খেলছে।

''কী শান্তি এখানে তাই নারে? কত দেশই তো দেখলাম।'' অনির্বাণ শান্ত গলায় বলল।

''তুই অনেক দেশ ঘুরেছিস?''

''অনেক। সেই ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে এমবিএ

করলাম। তারপর যে মাল্টিন্যাশনালে কাজ করতে শুরু করলাম, তাদের পৃথিবীজোড়া ব্যবসা। জানিস ক'টা নতুন দেশ ঘুরলাম এককালে হিসেব রাখতাম। ২৭ টা না ২৮ টা গোনার পর ছেড়ে দিয়েছিলাম।"

"কেন?"

"সময় পেতাম না রে। কোম্পানি আমার জীবনের প্রতিটা সেকেন্ড কিনে নিয়েছিল। নিজের জন্য ভাবার কোনও আর অধিকার ছিলনা।"

নীচু গলায় অরিন্দম বলল, "জানি। মস্ত কোম্পানির সিইও ছিলি তুই।"

"খবর রাখতিস তাহলে? যাকগে তোর কথা বল। "ম্লান হেসে অরিন্দম বলল, "আমার আর কী কথা? তুই ওদিকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চলে গেলি আর আমি গ্রাজুয়েশনটা কোনরকমে করলাম। তারপর কেরানীর জীবন। জানিস ভারতবর্ষের বাইরে কোনদিন যাইনি। মঞ্জরীর বড় শখ ছিল বিদেশ দেখবে। বিদেশ মানে যেকোনও দেশ। ভেবেছিলাম একবার নাহয় নেপালই নিয়ে যাব, সেটাও হয়নি।"

"কেমন আছে মঞ্জরী?"

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আস্তে আস্তে দুদিকে মাথা নাড়ল অরিন্দম।

"অ্যায়াম সরি। কি হয়েছিল? আমি ওকে সেই একবারই দেখেছিলাম তোদের বৌভাতের দিন।" -

"না, তুই ওকে আরো একবার দেখেছিলি।"

"তাই, মনে পড়ছে না রে। কিন্তু তারে স্মৃতিশক্তি তো এই বয়সেও খুব প্রখর।"

"সত্যি জানিনা আমি এখনো কেন কিছু ভুলিনা। এটা অভিশাপ। আচ্ছা, তোর 'আমাদের ছোট নদী এখনো মুখস্থ আছে?"

"বাহ! বেশ মজার কথা বললি। উমম... প্রথম দুটো লাইন মনে আছে। আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে, বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে। কিন্তু তারপর... তারপর আর নেই।"

"সাত সমুদ্র পেরিয়ে ভুলে গেছিস। আমার সেই সুযাগে হয়নি বলে বোধহয় মনে আছে,

চিক্ চিক্ করে বালি, কোথা নাই কাদা,
একধারে কাশবন ফুলে ফুলে সাদা।
কিচিমিচি করে সেথা শালিকের ঝাঁক,
রাতে ওঠে থেকে থেকে শেয়ালের হাঁক।" -

"বাঃ! তোর স্মৃতিশক্তি সত্যিই অসাধারণ। হ্যাঁ রে তোর ছেলেমেয়ে?"

"এক মেয়ে। সেও আমার মত অতি সাধারণ। তোর ছেলে তো শুনেছি তোর থেকেও কৃতী।"

একটু চুপ করে থেকে অনির্বাণ বলল, "অংকের বিচারে তাই। তাই আজ আমি এই বৃদ্ধাশ্রমে। বোঝাকে এখানে নামিয়ে গেছে। থাক খারাপ কথা বলব না। ছেলে আমার সত্যিই জুয়েল। নাসায় স্পেস সায়েন্টিস্ট।"

"আর তোর বউ?"

"অঞ্জনা," একটু চুপ করে থেকে অনির্বাণ বলল, "অনেক বছর হলো, ডিভার্সে হয়ে গেছে। বিয়েটা যদি টিঁকত, তাহলে হয়ত আজ এখানে... তবে বেশ হয়েছে। এইতো তোকে পেয়ে গেলাম। মনে আছে স্কুলে যতদিন একসঙ্গে পড়েছিলাম তোর আর আমার রোল নম্বর পরপর ছিল। থ্রি আর ফোর। এখানে আমার রুম নম্বর চব্বিশ। তোর?"

"আমি..." অরিন্দম কথা শেষ করতে পারলনা।

"বাবা! চলো। যাবে তো এবার।" অরিন্দমের পিঠে আলতো করে হাত রাখল অন্বেষা।

অরিন্দম মেয়ের দিকে একবার তাকিয়ে বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল, "অন্বেষা। আমার মেয়ে। চিনিস বোধহয়। এই বৃদ্ধাশ্রমেই তো কাজ করে। আজ এদিকে এসেছিলাম। ভাবলাম বাপ বেটিতে একসঙ্গে বাড়ি ফিরি। আর খুকু, উনি হচ্ছেন তোর অনির্বাণ কাকা। সেই স্কুল থেকে আমরা একসঙ্গে পড়েছি। বাড়িতে আমার যেমন। খেয়াল রাখিস, এখানে কাকার ঠিক সেরকমই খেয়াল রাখিস।"

পিতাপুত্রী হেঁটে মিলিয়ে যাচ্ছে। শহর জুড়ে অন্ধকার নামছে। অনির্বাণ বাকরুদ্ধ হয়ে চেয়ে রয়েছে। অন্ধকারের মধ্যেও এতো আলো, এত আলো পুরু চশমার কাঁচ সহ্য করতে পারছেনা। চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে।

নিষ্কৃতি

বিভা রায় চৌধুরী

এফই- ৫০৮/২

একটা শ্যুটিং উপলক্ষে কিছুদিন আগে সুন্দরবন গিয়েছিলাম। গল্পের পটভূমিকা ছিল সুন্দরবনের বনাঞ্চল, তাই ডিরেক্টর ওই অঞ্চলকেই শুটিং স্পট হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। ঘন অরণ্য। পাশে বয়ে চলা নদী। দূরে দূরে বাড়ি, ভাঙাচোরা এবড়ো খেবড়ো পথ। মাটির ঘরে খড়ের চাল, হাঁস, মুরগী, বিচুলী গাদায় তাকিয়ে এক অদ্ভুত আবেশে চোখ দুটি যেন মমতায় ভরে গিয়েছিল। খাদ্য নেই, পানীয় নেই; রাস্তা ঘাট, স্কুল, বাড়ি তাদের কাছে স্বপ্ন। দারিদ্র্য ভীষণ, দারিদ্র্যের জেল খানায় তারা অভ্যস্ত হয়ে গেছে। চারিদিকে জল। অত্যন্ত জলাজায়গা। নদীনালা কলকল করে বয়ে চলেছে, কিন্তু পানীয় জল? না। এক আঁচলা জল মুখে তোলা যায় না। খাবার জল আনতে হাঁড়ি কলসি বালতি নিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে অনেক অনেক নৌকা। কয়েক ঘন্টার পথ অতিক্রম করে তারা পানীয় জল সংগ্রহ করে প্রতিদিন। প্রচন্ড ঝড়, জল, বর্ষা, বন্যা, শীতে তারা ছুটেছে জীবনকে পায়ের ভৃত্য করে। কত নৌকা ডুবে যায়, কত লোকে তলিয়ে যায় স্রোতের টানে, কিন্তু এ বিরামহীন চলা থামে না। একটু অসতর্ক হলেই বাঘের খাদ্য হবার সম্ভাবনা। নতুন নয়—চলছে সেই ট্রাডিশন। নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে আনমনা হলে ক্ষুধার্ত কুমির এক ঝটকায় টেনে নিয়ে ডুব দেবে প্রবল স্রোতের অন্তরালে।

আমার ন'বছরের নাতনি ক্যামেলিয়া রুশা ছিল ছবির নায়িকা। তার সঙ্গে গিয়েছিলাম আমি। পুরানো ইউনিটটা উঠেছিল আনারের সাতজেলিয়া দ্বীপে। নদী, জলাশয় আর জঙ্গলে ঘেরা একটি দ্বীপ, তার মাঝে অপূর্ব সুন্দর একখানা দোতলা বাংলো।

ফলে ফুলে, গাছ গাছালিতে সাজানো সুন্দর বাংলোখানা যেন ওই দ্বীপের অলংকার। যা কলকাতায় দেখার সৌভাগ্য হয়নি।

অর্কিড, নানা প্রজাতির ফুলে বিশাল লন খানা নিপুণভাবে সাজানো। এই অঞ্চলটা সুন্দরবনের শেষ প্রান্তে সাগর থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে অবস্থান করেছ। এখানে দুটি অঞ্চল সাতজেলিয়া আর লাহিড়ীপুর। এই অঞ্চলে সব মিলিয়ে মোট ১৪টি গ্রাম। প্রথম দিনের শুটিং শুরু হল রজত জুবিলি গ্রামে। পাশেই পাথর পাড়া। এরই কোল ঘেঁষে বয়ে চলেছে বিরাট নদী যার নাম পাথর নদী। নদীর দুপার ঘেরা গভীর অরণ্যভূমি। বাঘের আনাগোনা হরদম চলছে, তবে নদীর এক পার জনবসতি পূর্ণ হওয়ায় উৎপাত কম। সতর্কতা বেশি।

অপর পার ঘন জঙ্গল। নদীর কোল ঘেঁষে উঁচু জাল দিয়ে মাইলের পর মাইল ঘিরে রাখা হয়েছে। তার ফাঁক ফোঁকর গলে যেখানে নদীর গভীরতা কম সেই অঞ্চলে সাঁতরে বাঘেরা জনবসতিতে ঢুকে পড়ে, নদীর পারে ওতপেতে বসে থাকে। এক কাহিনীকারের মুখে গল্প শুনেছিলাম এ্যানপুর ও যেসোমপুর গ্রাম দুটি কিছুটা সুরক্ষিত। এই গ্রাম দুটি দুজন ইংরেজ সাহেবের নাম অনুসারে হওয়ার একটা ইতিহাস আছে। পুরো অঞ্চলটি গোসাঁড়ার অন্তর্গত। কথিত আছে এই অঞ্চলের জমিদার স্যার ড্যানিয়েল মেকিনোং হ্যামিলটন। খুব প্রজাবৎসল সহৃদয় এবং উদারলোক ছিলেন তিনি। তার স্ত্রীর নাম এলিজাবেথ হ্যামিলটন। অত্যন্ত স্নেহশীল সুন্দর চরিত্রের নারী ছিলেন। বাংলা মায়ের সুজলা সুফলা ধানে, পানে, মাছে, ভাতে প্রজাদের ছিল সুখের জীবন। এই জমিদার দম্পতির কোনো সন্তান ছিলো না। তাঁদের মৃত্যুর পর তার ভাইপো জেমস হ্যামিলটন জমিদারির মালিক হন।

পূর্বসূরীর নির্ধারিত পথেই তিনি প্রজাদের সুখে রাখার চেষ্টা করে গেছেন। এমনকি তার স্ত্রী এ্যানি হ্যামিলটনও প্রজাদের সুখ্যাতির অধিকারিনী হন। সেই এ্যানি মেমসাহেবের নামে এ্যানপুর গ্রাম। স্যার ড্যানিয়েল এই সুন্দরবনের সমবায় প্রবর্তন করেন। এই প্রথা বাঁকুড়ার ছাদনাতে পত্তন করেছিলেন গুরু সদয় দত্ত। অর্থাৎ গুরুসদয় দত্ত এই প্রথার প্রবর্তক।

জমিদারি দৃঢ় করতে বা জমিদারির স্তম্ভই হচ্ছে জনসমষ্টির বৃদ্ধি এবং তাদের নানারকম সুযোগ সুবিধা দিতে শুল্ক জমিদার ছিল প্রচন্ড তৎপর। নানারকম কৃষিপণ্য পাট, তুলো, কাঠ, মাছ ইত্যাদি দেশীয় সম্পদে দেশের উন্নতির সার্থক রূপ দিতে পেরেছিলেন। শ্রম এবং শ্রমবদ্ধ সম্পদ ছাড়া দেশ এগোতে পারে না। এই শিক্ষা ইংরেজরাই দেশবাসীকে শিখিয়েছিলেন। ওদেরই গবেষণার ফল চা শিল্প। এখানে ওরা বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জনগণকে নানা সুবিধে দিয়ে এই শিল্পকর্মের উন্নতি বা পত্তন করেছিলেন, যে সময়ের কাহিনী লিখে চলেছি তখনও ইংরেজ শাসন শুরু হয়নি। মুসলিম শাসনের আগ্রাসনে জনজীবন তখন অতিষ্ঠ। আতঙ্ক, ভয়, নির্মমতার কবলে মানুষজন জীবন্মৃত। গোটা দেশের বুকে তখন আতঙ্ক-রক্তাক্ত-জল দিনরাত্রি বয়ে চলছিল। জমিদারদের অবস্থা ছিল এতটাই ভয়াবহ ছিল যে, যে-কোন সময়ে তাদের ওপর নতুন নতুন আদেশ এবং নির্মমতা নেমে আসত। প্রজাদের মঙ্গলে এবারে নিরাপত্তা দিতে জমিদার ছিলেন অত্যন্ত সতর্ক। ঐকান্তিক চেষ্টা এবং সুপরিকল্পিত জমিদারদের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচাতে তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না।

এক সময়ে উনি বুঝতে পারলেন এই লুটেরাদের হাত থেকে বাঁচা সম্ভব নয়। নারীহরণ ও পরের সম্পত্তি আত্মসাৎ, ফসল কেটে নেওয়া ক্রমাগতই ঘটে চলেছিল। এই সময় মুসলমান সম্রাটের সঙ্গে বারোভূঁইয়াদের সংঘাত শুরু হয়।

শাসকের সৈন্যরা উঠে পড়ে লাগলো বারোভূঁইয়াদের ধ্বংসের চেষ্টায়। দুপক্ষের দীর্ঘ লড়াই ক্রমাগত ভীষণ আকার নিতে লাগলো।

পরাক্রমশালী শত্রুর সাথে বেশিদিন লড়াই সম্ভব না বুঝে বারোভূঁইয়ারা তাঁদের অতুল সম্ভার জাহাজ ভর্তি করে নিয়ে জল পথে গোপনে সুন্দুরবনের দিকে রওনা হতে লাগলেন। তারা ভেবেছিলেন শত্রু পক্ষ আক্রমণ করলেও এ সম্পদের সন্ধানে পাবে না। ভাবনাটি ফলপ্রসু হলো না। শত্রু সেনারা হন্যে হয়ে খোঁজ করে সুন্দরবনের সন্ধান পেয়ে বিপুলবাহিনী নিয়ে সেদিকে যাত্রা করলো। প্রমাদ গুনলেন বারোভূঁইয়ারা। বাঙালির এই অতুলনীয় সম্পদ রাশি কখনোই শত্রু সেনার কবলে পড়তে দেবে না। তাঁরা নিজেদের মধ্যে ঠিক করে জাহাজ ভর্তি সম্পদ ডুবিয়ে দিলেন সুন্দরবনের নদী এবং সমুদ্রে। সমুদ্রেরতলে তলিয়ে গেল বাংলার ধন, ঐশ্বর্য, সম্পদ। ঝাঁপিয়ে পড়লো সেনার দল। স্বর্গ, মর্ত, পাতাল খুঁজেও তারা কিছু পেলো না। আক্রোশে জ্বলে উঠলো তাদের রক্ত। শুরু হলো ধ্বংসলীলা। একের পর এক নদীর বাঁধ কেটে দিতে লাগলো। জল সম্পদে ভরা অতুল জল রাশি বুকে করে দাঁড়িয়ে আছে সুন্দরবন। এবার হু হু করে ঢুকতে শুরু করলো সমুদ্রের জল। তিক্ত লবণাক্ত।

মানুষজন গরু, ছাগল, পশুপাখি এবং একের পর এক বসতি জলে জলাকার হয়ে গেল। সুমিষ্ট জল লবণাক্ত হয়ে গাছপালা ফসল সব শেষ হয়ে গেল, চারিদিকে থইথই জল মুখে দেবার উপায় নেই। গৃহহারা স্বজনহারা মানুষের ঘরে ঘরে মৃত্যুর হাহাকার। সুন্দরবন অবহেলিত তার গোড়ার কাহিনী ছিল এইরকম। অনেকক্ষন একটানা পরম উত্তেজনায় এই দীর্ঘ গল্পটি বলে মাথা হেঁট করে দম নিলেন পচানব্বই বছরের জোয়ান রুকুনুদ্দিন মল্লিক। আবার শুরু করলেন সমস্ত শহরবাসীর মুখে অবজ্ঞার ভাঁজ সুন্দরবনের নামে। নেতারা সুন্দরবনবাসী মানুষদের মানুষ ভাবেন না। তাই ফিরেও তাকান না। কিন্তু কীভাবে কাদের জন্য এই অঞ্চলের মানুষ, মানুষ নয়, আজ এই সম্পদ জমির সংস্কার হয় কিনা তা ভাবার সময় কারো নেই। একের পর এক বাঁধ কেটে ধ্বংস করে দিলো সুন্দরী সুন্দরবনকে। গাড়োল পাথর নদী রায়মঙ্গল, শুধণ্যখালী, বিদ্যে, মরিচ ঝাঁপি, ডুমুর, পুরারে, নেতা, ধায়োনি, নবাকি ইত্যাদি। অজস্র নদীর এবং তাদের শাখা প্রশাখার মধ্যে একাকার হলো সুমুদ্রের জল। জঙ্গলের পর জঙ্গল ক্ষেত ভরা ফসল আর অফুরন্ত মাছের জন্মস্থান সব ধ্বংস হয়ে গেলো। মাছ আর ধান ছিল এখানকার প্রধান আয়ের উৎস এবং খাদ্য। মিষ্টি জলের দামি দামি মাছ মরে শেষ হয়ে গেলো চিরদিনের মতো। খাদ্য পানীয় অভাবে এই সব অঞ্চলের মানুষ হু হু করে পালাতে লাগলো। শ্মশান হয়ে গেলো সুন্দরবন। আজও আমরা খাবার জল পাই না। প্রতিদিনের জল আসে নদী পথে, নদীই এক মাত্র ভরসা আমাদের। এইভাবে এখনো কিছু গ্রামে আমরা টিঁকে আছি। আমাদের অবস্থা দেখে কোনো জনদরদী নেতা নন

একজন বি.ডি.ও উপলব্ধি করে কিছুদিন হলো পানীয় জলের কিছুটা ব্যবস্থা করেছেন। তাঁর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। দেশ নাকি অনেক এগিয়েছে। বিজ্ঞান অনেক অনেক দিয়েছে। শিক্ষা, সভ্যতা এবং সৎভাবে বেঁচে থাকার পথ এখন উন্মুক্ত। তাহলে আমরা কেন অন্ন, জল, যানবাহন, শিক্ষা বা বেঁচে থাকার মতন পরিস্থিতি দেখতে পাইনা। স্কুল, কলেজ নেই, রাস্তা ঘাট নেই, মাঠ ঘাট জঙ্গল পেরিয়ে নদীপথের উপর ভরসা করে বেঁচে আছি। শিশু জন্মাচ্ছে আলো, বাতাস শিক্ষাবিহীন এক কঠোর জীবনযাপনকে ভাগ্যলিপি করে, ঘুরে দেখে যাবেন একটা রাস্তা পাবেন না। এখানে পাকাবাড়ী নেই।

এ মাটিতে ইঁট হয় না। অদম্য ইচ্ছে এবং মেধার জোরে বেশ কয়েকজন গ্র্যাজুয়েট হয়েছে। দূরদূ রাস্ত হেঁটে গিয়ে পড়াশোনা করে এখানকার ছেলে মেয়েরা। নিজেরাই নিজের ভাগ্য গড়তে চাইছি বা গড়ে নিচ্ছি। ভাবতে পারেন হঠাৎ কেউ অসুস্থ হলে হাসপাতাল নেই, কোন ডাক্তারখানা নেই! কোন প্রসূতির প্রসব বেদনা হলে তাকে এই জল পথে দিয়ে যেতে হয়। হয়তো এই জলের বুকে শিশুটির জন্ম হয়। অসুস্থ রোগী নৌকোতেই মৃত্যুবরণ করে। বন্যা আমাদের সাথী। আজ যেখানে আমাদের শুটিং হচ্ছে কযেকদিন বাদে এসে দেখব এখানে শুধু জল আর জল। এই যে নদীর পাড় ঘেঁষে অসংখ্য মানুষ শুটিং দেখতে দাঁড়িয়ে আছে। ওখানেই কখনো কখনো ওতপেতে থাকা কুমির, বাঘ চলে আসা বিচিত্র নয়। দামি দামি গাছ বন্যার নোনা জলের কারণে মরে মাঠ হয়ে যায়। দুঃখ হয় এই বিশাল সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণে কোনো সরকার এগিয়ে এলো না আজও। আমাদের বিরাট কোন চাহিদা নেই। শুধু বাঁচতে চাই, সেই বাঁচার জন্য চাই চিকিৎসা ব্যবস্থা, রাস্তা, শিক্ষা আর খাবার জল—এটা কি খুব বড়ো দাবি সরকারের কাছে?

বেলা পড়ে এসেছে। শুটিং সেদিনের মত শেষ। ভদ্রলাকে উঠে দাঁড়ালেন তাঁকে এ কাহিনী বলার জন্য ধন্যবাদ দিলাম কিন্তু উল্টে আমাকে অনুরোধ করলেন দয়া করে আমাদের এই দুঃখগুলো সভ্য সমাজকে একটু জানতে দিন।

যা লিখলাম, তা কতটুকু সত্য বা সঠিক কতটুকু মুখে মুখে কালের স্রোতে রঞ্জিত বা বর্ধিত তা আমার জানার কথা নয় কতটুকু ইতিহাস গ্রাহ্য কতটুক প্রামাণ্য তাও আমি জানি না। কেন না আমি সুন্দরবনের ইতিহাস নিতে যাইনি। গিয়েছি নাতনির শুটিং এর সঙ্গী হতে। পরেরদিন শুটিং স্পট ছিল আরও অনেক দূরে অন্যদিকে। ঘরে ঘরে বেল বাঁজিয়ে অভিনেতা অভিনেত্রীদের জাগিয়ে দেওয়া হোত। ভোর পাঁচটায়।

বেড-টি-র পর যে যার প্রাতকৃত্য সেরে মেকআপ লাগিয়ে বসে যেত। সাতটায় বোট রেডি, শুটিং সেটে নিয়ে যাবার জন্য তৈরি। বিশাল বাংলোটা জুড়ে ভোরবেলায় মহাযজ্ঞ শুরু হত। প্রায় আধঘন্টা অতিক্রম করে বোট যেখানে পৌঁছালো সেখানে ভাঁটার টানে প্রচণ্ড কাদা, কোনমতে সেই কাদা অতিক্রম করে শুটিং স্পটে পৌঁছলাম। অভিনেত্রী ভারতীদেবীর বয়স হয়েছে। তার পক্ষে ওই পেছল পথ পার হওয়া কোন মতেই সম্ভব নয়। তাকে শেষ পর্যন্ত কোলে করে শুটিং স্পটে এনে নামানো হল।

অবাক হলাম সেখানে গিয়ে দেখি, সুন্দর একটি মাটির ঘরবাড়ি। রান্না ঘর, শোবার ঘর, বারান্দা, গোয়াল গরু-ছাগল-মুরগী, তুলসীতলা, উঠোন, ধানের গোলায় - অদ্ভুত সুন্দর সুন্দর গ্রামের বাড়ি। শুনলাম, ওই জায়গায় ওইভাবে কদিন আগে থেকে গ্রাম্য পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। নদীর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে একখানা বার্জ। সেটাকে নাকি সমুদ্রপথে এখানে আনা হয়েছে প্রচুর টাকা ভাড়া দিয়ে। যত দেখছি অবাক হচ্ছি। ওই সুন্দর বাড়িখানার বহুদূর থেকে চারধার উঁচু বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা হয়েছে যাতে দর্শক জনতা ভেতরে ঢুকতে না পারে। গ্রামবাসীর জানা ছিল তাই ভোর থেকেই দূর দূর গ্রাম থেকে কাতারে কাতারে লোক বেড়ার ওপাশে অপেক্ষা করছে। টেকনিশিয়ানরা যন্ত্র জুড়ে জুড়ে শুটিং-এর আয়োজন করছে। বার্জের ভেতর জেনারেটর চলছে সেখান থেকে আলোর ফোয়ারা বইছে ওই বিরাট শুটিং ক্ষেত্রের সর্বত্র। আমার ছোট নাতনি গল্পের নায়িকা বোট থেকে নামার পর আমার অতি সুশান্ত নাতনিটির কণামাত্র বিশ্রাম নেই। পুরো ইউনিটটার অফুরান্ত আদরে সে সবাই কে নাচিয়ে বেড়াচ্ছে। ক্যামেরা ম্যান, সাউণ্ড রেকডিস্ট, মেকআপ ম্যান, অ্যাড ডিরেক্টর, প্রোডিউসার, অডিটর এমন কি ডিরেক্টর পর্যন্ত ওর

সহজ সরল আচরণে মুগ্ধ হয়ে কাটিয়েছে শুটিং-এর দিন কটা। নাচ ও গানের জোয়ার ছুটে যাচ্ছে। গভীর জঙ্গল আর এক ঘেঁয়েমির মধ্যেও হয়ে উঠেছিল হৃদয় স্পন্দন।

ও একাই গান গেয়ে নাচতে শুরু করলো। ব্রিগেড মাঠে মিটিং হলো। ভাষণ দিলো নেতা লরি চেপে ঘুরে এলাম শহর কলকাতা। পুরো গানটি গেয়ে আপনমনে বিরাট উঠোনটার মধ্যে নাচতে লাগলো কেননা তখনো যন্ত্রপাতি, লাইট ক্যামেরার পজিশন ঠিকঠাক হচ্ছে। পুরো ইউনিট হাততালি দিয়ে ওকে চিয়ারাপ করছে। সাউণ্ড রেকর্ডিস্ট ভদ্রলাকে ওর সব গান-ছড়া-অন্তখারী তার সাউণ্ড বক্সে জমা করে চলেছেন। ক্লান্ত হয়ে মেকআপ ম্যান-এর কোলে বসে মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিচ্ছে আমার নাতনিটি। তাঁদের ভালোবাসা দেখতাম আর ভাবতাম বিদেশ বিভূঁয়ে সমস্ত অপরিচিতদের নিয়ে কী মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠলো।

নাচ-গান শেষ হতে বিরাট দর্শককুল থেকে চিৎকার উঠলো তারা নায়িকাকে কাছ থেকে দেখবে। এদিকে নায়িকা তখন জুজু। সাউণ্ড ডিরেক্টরের বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে তার গলা জড়িয়ে রয়েছে। চিৎকার থামে না। ব্যারিকেডের বেরা ধরে গিজ গিজ করছে জনতা। চিৎকার বন্ধ করার জন্য উঠোনের মধ্যেখানে সাউণ্ড রেকর্ডিস্ট বক্সটাকে চালিয়ে দিলেন। জনতা চুপ ওর সব কীর্তি ওখানেই জমা ছিল। তারপর ওকে কোলে করে মেকআপ ম্যান ব্যারিকেডের একটু দূর থেকে ওকে ঘুরিয়ে নিয়ে এলেন। শুটিং স্পট রেডি অভিনেতা অভিনেত্রী, কলাকুশলী সবাই প্রস্তুত। আমি বেশ খানিকটা দূরে গাছেরতলায় একটা চেয়ার এ বসে আছি। এতো কলাকুশলীর ভিড়ে সব শুটিং দেখা সম্ভব নয়। চুপচাপ বসে আছি, কিন্তু নজর শুধু নাতনির দিকে। যে গল্পটার শুটিং হচ্ছিলো তার নাম কাহন। কাহন একটি এগারো / বারো বছরের ছেলে। কয়েক বছর আগে তার বাবাকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। যারা মধুর সন্ধানে যায় তারা নির্বিঘ্নে ফেরে না সবাই।

কাহন এর বাবাও পারেনি। বাকি সঙ্গীরা ফিরে এসে এ খবর জানালে স্ত্রী এবং মা তা মেনে নেয় কিন্তু অবোধ শিশুটি দিনের পর দিন জঙ্গলে নদীর পারে ঘুরে বেড়ায়, বাবাকে খোঁজে। জেলেরা মাছ ধরতে যায়। সুন্দরবনের জঙ্গলে মধু খুঁজতে। ও চিৎকার করে সেইসব মাঝিদের উদ্দেশ্যে বলে তোমরা আমার বাবাকে বোলো আমি তার জন্য নদী কিনারে অপেক্ষা করছি। দারিদ্র্যের সংসার বাঁচানোর তাগিদে শাশুড়ি আবার বউয়ের বিয়ে দেয়। ওখানেই তারা থাকে। নাতিকে তাদের আছে পাঠাতে পারেনি। বিরাট আক্রোশে শিশুটি ফুঁসতে থাকে। সে ঠাকুমাকে নিয়ে চলে যায় তাদের নিজেদের ঘরে। নানান কবিরাজি ঔষধ তৈরী করে ঠাকুমা ও তাকে সাহায্য করে। এভাবেই দিন কাটে। মায়ের কাছে যায় না। মায়ের কোলে বোন আসার পর তার আক্রোশ আরো বেড়ে যায়। ঠাকুমা বোঝার ও তোর বোন ওকে ভালোবাসতে হয়। কে কার কথা শোনে, বোন দাদাকে ভালোবাসে। ছুটে ছুটে কাছে আসে। দাদার পেছন পেছন জঙ্গলে জঙ্গলে নদীর পারে ঘোরে দূরে থেকে। কিন্তু দাদা যেই দেখে, বিরাট প্রতিহিংসায় ওকে তাড়া করে, 'যা যা দূর হ বালাই', প্রবল বিক্ষোভ গর্জে ওঠে নায়িকা। শুটিং স্পটে গিয়ে আমার জীবনে আমার অজান্তে এসে দাঁড়ায় পরান। একটি মুসলিম শিশু। পরাণ এবং পরাণের মুখে শোনা কাহিনী আমাকে এমনভাবে স্পর্শ করেছিল যার জন্য আমি কলম ধরেছি একটি নারী তার বিপন্ন যৌবন এবং একটি শিশু নিয়ে সমাজের রাজপথে দাঁড়িয়ে কত অসহায়-কত লাঞ্ছিত-কতটা অবহেলিত।

অপরদিকে শিশুটির সর্বহারা জীবনে নির্মম দেবতার কি অভিশাপ! শুটিং চলছে খোলা আকাশের নিচে। সম্পূর্ণভাবে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, দশ-বারোটি ছোট ছোট গরান গাছের একটি গুচ্ছতলায় সূর্যকে আড়াল করে বসে চা খাচ্ছি। এই বসা ক্ষণস্থায়ী। সূর্য সরবে, ছায়া সরবে আমাকেও স্থান পরিবর্তন করতে হবে। একটু দূরে দেখি নদীর পাড় ঘেঁষে ৯-১০ বছরের একটি ছেলে। সারা দেহ অপুষ্টিতে পূর্ণ। কোঁকড়ানো চুল, টানা চোখ শুধু এদিক ওদিক ঘুরছে। ফাঁকফোকর দিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা শুটিং দেখবার। যেই তাড়া খাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে পেছিয়ে যাচ্ছে, আবার স্থান খুঁজছে যতটুক দেখতে পাওয়া যায়। হঠাৎ দেখি ছেলেটি অঝোরে কাঁদছে। কি যেন মনে হওয়াতে, সবার চোখ এড়িয়ে আমি ওকে ভেতরে আমার পাশে নিয়ে এলাম। হাতে

দুটো বিস্কুট এগিয়ে বললাম খা খা-না। ও মাথা নাড়ল খাবে না। প্রশ্ন করলাম কাঁদছিস কেন, কেউ তোকে মেরেছে? চোখ মুছতে মুছতে আবারও মাথা নাড়লো-না কেউ মারেনি। এ দিকে আয় খা না কেউ তোকে কিছু বলবে না। ও হাত পেতে বিস্কুট দুখানা নিলো। প্রশ্ন করলাম কাঁদছিল কেন? - ওই যে প্লে করছে, ওই হাওয়ালাটার (ছেলে) জন্যি। ছেলেটাকে তোর ভালো লাগছে? খুব। ওর জীবনটা ঠিক আমার মতো। আর মেয়েটাকে, ওকে ভাল লাগছে না ? দূর। ওকে আমার মারতি ইচ্ছে করছে। দুম দুম করে। কেন ও কি করল? আমার মারও একটা মেয়ে হইছে। ওমা... ও তো তোর বোন, ভালো তো ? দুর। ছাড়ো তো, বুন না ছাই, আপদ একটা। আরে, তোর নামই তো শোনা হল না, তোর নাম কি?

শুটিং চলছে। রোদ প্রায় মাথার ওপর। লঞ্চে করে বাংলো থেকে দুপুরের খাবার এসে গেছে।

চারিদিকে খাবার তাড়া। কাজ কিছুক্ষণ বন্ধ। আমার নাতনিকে ওরাই আমার কাছে পৌঁছে দিয়ে গেল খাবার জন্য। নিজেও খেলাম।

আবার কাজ শুরু হল। ছেলেটিকে আর দেখতে পেলাম না। তারপর দুদিন অন্য দিকে শুটিং হলো। অষ্টম দিনে আবার এখানে ফিরে এলো সবাই। এবার খোলা আকাশ নদী বা জল নয়। আগের তৈরী বাড়ি ঘর, হাঁস, মুরগী, গরু, ছাগল নিয়ে একটি পারিবারিক শুটিং চলছে। চললো দুদিন। ছাগল কোলে করে নায়িকা।

এখানে নায়িকার প্রাধান্য বেশি। পিঠের উপরে একগুচ্ছ খোলা চুল। পরনে মলিন শত চিহ্ন একখানি ছোট্ট শাড়ি, এক বগলে ছাগল ছানা, ওপর হাত বাড়িয়ে ছুটছে মুরগির পিছনে। চোখ মুখ লাল করে বলছে ''বড়ো বার বাড়িছি তাইনা?'' ''চল আজ বাড়ি দেহি কেডা তোকে খেতি দেয়। এতো রোদে ঘুরতেছিস, জ্বর জালি হলে কেউ দেখবে? সেই আমি।'' ছুটন্ত মুরগিটাকে ধরে বাবা ছাগলবাচ্চাসহ মেয়েটাকে কোলে তুলে নিল। কুসি বলে দ্যাও তো বাবা ওভাবে আছি শেষে দিয়ে পূন্য দেহ মেয়ের মুখে চুমু খেয়ে বাপ বলে আজ থাকে সা।

একটু দূরে মা গরুর বিছুলি কাটছিলো। কুমি হাঁক দিলো, মা, বাড়ি যাবা না; কহনে খাতি দেবা, চলো, চলো মা এথনি খাতি দেবো। তুমি তোমার বাপ খাতি লাগাবে। বাবার কোলে মেয়ে, মেয়ের কোলে ছাগলছানা পর পর এগিয়ে চলেছে তিনজন।

হঠাৎ কানে এলো কাট কাট। ডিরেক্টর এগিয়ে এসে কুমিকে চুমুর পর চুমু দিয়ে বললেন চমৎকার, চমৎকার। যন্ত্রপাতি অন্যদিকে দ্রুত অন্যপটভূমি তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আধঘণ্টার মধ্যে শুটিংস্পট তৈরী। আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না বলা চলে।

কারণ বেশ খানিকটা জঙ্গলের মধ্যে শুটিং চলছে ছেলেটি বনদেবীর পুজো করছে বাবার কল্যাণে। মেয়েটি দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে, কাছে যাবার সাহস নেই। প্রচন্ড ঝড় উঠছে কিন্তু দাদাকে ফেলে ঝড়ের দাপটে বিধ্বস্ত হলেও নড়ছে না। চুল খোলা, খালি গা, পা, একখানি ছোট্ট কাপড়ে গাছের ডাল চেপে ধরে সে তার নাক-মুখ, চোখ খোলা, চুল ও পরণের কাপড়খানি সামলাচ্ছে। চোখে মুখে উপচে পড়া কান্না ঝরতে পারছে না।

হঠাৎ দেখি পরাণ এসে আমার পাশটাই দাঁড়িয়ে আছে। বললাম কি রে শুটিং দেখা ছেড়ে এখানে এলি কেন, যা। ও বললো তোমাকে আমার খুব পছন্দ, তাই তোমাকে দেখতি আলাম।

খেয়েছিস? তোরা মা বাবা কোথায় মানে তোর বাড়িতে কে কে আছে? আমার কেউ নাই। আহা! তাই? তা তুই কার কাছে থাকিস? ছুটে এসে আমার পায়ের কাছে বসে পড়লো। কান্না ভরা গলায় বললো, ও মাসি শুনবা আমার জেবানের সব কথা? কোবো? আমার মন যা চাই সব কই? একঘেয়ে বসে সময় কাটছিল না। আট দিনে অনেকটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি একটা শিশুকে কাছে পেয়ে তার দেশীয় ভাষায় কথাগুলো শুনতে কেমন যে মজা পাচ্ছিলাম, বললাম বল, বল তোর গল্প। ও মাসি, গল্প নয় সত্যি। আমি সত্যি কথা কোবো তোমারে। তাকিয়ে দেখি ওর দুচোখ ভেসে জলের ধারা নামছে। ও যা বলেছিল সংক্ষেপে সেটাই আজ লিখছি। একটা ছোট বালকের মুখের কিছু কথা কখনো কখনো অশ্লীন লেগেছে। গাটা শির শির করছে।। তবুও তা লিখতে হবে কারণ ওটাই বাস্তব।

প্রতি রাতে দরজায় শব্দ হয় - ফতেমা দরজা খোল এমনি এমনি চাই না, তোকে টাকা দেব। তেমনই কলঙ্কের বলি। লোকে ওকে সমাজচ্যুত

করতে দ্বিধা করবে না। দিদি তার স্বামীকে পাঠিয়েছিল বোনকে নিতে। ঘরে তালা দিয়ে সমস্ত মালপত্তর গরুর গাড়িতে তুলে ওরা প্রস্তুত নৌকায় ঘাটের উদ্দেশ্য। পাড়া প্রতিবেশী সবার চোখে জল। মা ছেলে আপনঘর, আজন্মের বাসস্থান সব ছেড়ে শুধু পুরুষের লোভের হাত থেকে বাঁচতে অনির্দিষ্টের পথে ঝাঁপ দিল। পেটের দায়ে নয়, একাকিত্বের ভয়ে নয় শুধু তার শরীরটাকে বাঁচাতে। এই যে যাত্রা কি নিরুপদ্রপ হবে? এ প্রশ্ন ফতেমার জাগ্রত চেতনাকে ক্ষতবিক্ষত করতে লাগল, সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পরাণের খেলার সাথী, সবার চোখে জল। ফতেমার মিষ্টি স্বভাবে যারা আকৃষ্ট, তারা এই বিচ্ছেদে ফতেমাকে জড়িয়ে কাঁদছে। এভাবে সে আপন সংসার নিজ গৃহ নিজস্ব সংসার পরিবেশ পরিজন ছেড়ে চলে যাবার সিদ্ধান্ত কেন নিল? ঠাকুরদা, ঠাকুমা মেনে নিলে ঐ জ্যাঠাকাকারা ভালো চোখে দেখত না। মা বাবা থাকে না চিরকাল, তাদের মৃত্যুর পর অশান্তি শুরু হল। ওর বাবা একটু একটু করে চাষে মন দিতে লাগল কিন্তু পালা গান, যাত্রা এসব থেকে একটুও সরে আসতে পারল না। দিন কাটছিল ভালই। পরানের গলা ছিল ওর বাবার মত সুন্দর। ওর বাবা ওকে শিশুশিল্পী হিসেবে গান করা অভিনয় কারা শেখাতে লাগল। দূরে দূরে ছেলেকে নিয়ে অভিনেয় যেত। পরান ওর বাবার মত চমৎকার অভিনয় শিখে কতলোকের প্রশংসা পেতে লাগল। জীবন বড় অস্থির। সময় বড় নিষ্ঠুর। নিয়তি টানলো ওর বাবাকে। সন্ন্যাস রোগে হঠাৎ আচমকা বাবার দেহটা নিথর হয়ে গেল। বাবার কবরের মাটি আঁকরে মাথাকুটে ''ওরে আল্লার'' বলে অনেক কেঁদেছিল পরান। পরানের বুক ধুকধুক করছে বিচ্ছেদের আগুনে। মায়ের ওপর ওর খুব রাগ হল, ভাবলো বাবা না মরে মা মরলে আজ তাকে সবাইকে ছাড়তে হোত না। অশান্ত পরান, স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। ভাবছে মেয়েমানুষ বলেই তো মা আজ পালাচ্ছে। আমাকেও তার সঙ্গী হতে হল। হয়তো সর্বক্ষণ ওর মাও ভাবছিল ও যাত্রায় কি নিস্তার মিলবে? অভাগ্যের খালায় নতুন কোনো ফাঁদ অপেক্ষা করছে না তো? ওখানকার পুরুষ কি নারী মাংস পিয়াসী হবে? না। নিরামিষ সমাজ কোন স্বর্গে যেখানে নারী তার নিজস্ব জীবন নিয়ে সমান অধিকারে বাঁচতে পারে। সূর্য প্রায় ডুবে গেছে। আকাশের কপালে তেজহারা রক্তবর্ণ একখানা টিপ যার প্রতিবিম্ব কাঁপছে নদীর জলে। ডুবন্ত সূর্যের দিকে তাকিয়ে মা ছেলে ভাবছে এই আলো বিলিয়ে হারিয়ে যাবে আজ সুখে-দুঃখে গড়া একটা অধ্যায়। সন্ধ্যা কিছু আগেই শেষ হয়েছে। রাত এগোচ্ছ তার পূর্ণতার দিকে। নৌকার কালিপড়া হ্যারিকেনটা দুলছে, আলো-ছায়ার-ঘোলায়। মায়ের কোলে কাত হয়ে শুয়ে বাইরের নিঃসীম অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছে পরান। আকাশের বুক কালো করা মেঘ ডাকছে ছলাৎ ছলাৎ করছে কুলহীন নদীর জল। মেঘটা একসময়ে গাঢ় হল। মাঝিরা সর্তক হচ্ছে। ঝড় উটছে। দাঁড় বাইছে তাড়াতাড়ি। শোঁ শোঁ শব্দ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল ঝড়। সঙ্গে অঝোর কান্নায় ভেঙে পড়েছে মেঘ। কড় কড় শব্দে বাজ পড়ছে মিনিটে মিনিটে। অন্ধকারে নৌকায় শব্দ যাত্রীদের মুখে চোখে ভয় ঝলক ছড়িয়ে দিচ্ছে সেই বিদ্যুতের আলো। এক মাঝি বলে অপর মাঝি কে—সামাল সামাল সামাল—দিদির বাড়ি সম্পন্ন পরিবার, ভাত কাপড়ের চিন্তা নেই। ৬টি ছেলেমেয়ে নিয়ে দিদির সুখের সংসার। সপ্তমজন প্রস্তুত হচ্ছে পৃথিবীর বুক আলো করতে।

অফুরন্ত স্নেহে দিদি মা ছেলেকে গ্রহণ করেছিল —সব দুঃশ্চিন্তা ছেড়ে ফতেমা এক নতুন জীবন পেল। ভাইবোনদের মাঝে পরান সব দুঃখ ভুলে গেল। ছ'মাসের মধ্যে রুপসী ফতেমার রূপের আগুনে ঝলক লাগলো। ভগ্নিপতির লোভের আগুন। রাতবিরেতে শুরু হল কামনার স্রোত। পোড় খাওয়া ফতেমার বুকে সন্দেহের আগ্নেয়গিরি।

সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে ভগ্নিপতি ডাকে। কই গো ছোট গিন্নি, এতো কি কাজ তোমার, ইদিকে আস কখন বলে, চোখ ধরলো মোর জন্যি একখানা কাপড়, দ্যাহো পছন্দ হল কিনা। দিদির মন আনন্দে ভরে যায় - ফতেমার বুকে আতংকের শিহরণ। খাওয়া-দাওয়া শেষে রোজ রাতে ভগ্নিপতির গল্প শুরু হত শালির সঙ্গে। কিছুক্ষণ বাদে হাইতুলে দিদি শুতে যায়। ফতেমা কাঁপে থর থর করে। অভিজ্ঞ পরান সর্তক হয়ে ওঠে, পাহারা দেয় মাকে। মায়ের ভয়ার্ত মুখে বিপদের ছায়া দেখে। মাকে পুরুষরা টানছে। মা কোথাও স্বস্তি পাচ্ছে না। এ উপলব্ধি ওর ভেতর পরিনত বুদ্ধির মানুষের মত জেগে উঠেছিল।

ও বুঝেছিল। এটা দুর্ভাগ্য সম্পর্কের অলি গলি। এক রাতে ওরা দরজা বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়েছিল। গভীর রাতে কাটি দিয়ে খিল খুলে মেসো ঢুকে পড়েছিল ওদের ঘরে। মায়ের চিৎকারে মেসো তার মুখ চেপে ধরে ছিল। ওদের ধাক্কায় ওর ঘুম ভেঙে গেল। মা চিৎকার করে মেসোর চুলের মুঠি ধরে ঝুলে পরেছিল। পাশের ঘর থেকে মাসি এসে স্তব্ধ হয়ে দাড়িয়ে ছিল। মা ছুটে গিয়ে মাসিকে জড়িয়ে ধরে আকুল স্বরে অনেক কাঁদলো। মেসোর তর্জন গর্জন হুমকির বহরে এতো বড়ো অপরাধের প্রতিবাদ করার কারোর সহস হল। না। পরের দিন মাসি গ্রামের মোড়লের মাধ্যমে পাত্র খুঁজতে শুরু করল মিলেও গেল পাত্রের বয়স সাতান্নো। সাতটি সন্তান রেখে তার দুই স্ত্রী গত হয়েছেন। দুটি মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। বর্তমানে পাঁচটি সন্তান নিয়ে সে খুব বিপন্ন তার ঘর সংসার সামলাতে একজন মেয়ে মানুষ দরকার। বিরাট কারবার কর্মচারীর সংখ্যাও কম নয়, তাই এই বিরাট পরিবার এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। পরের দিন পাত্র এলো পাত্রী দেখতে। পাত্রী দেখেই পরানকে নিয়ে বিয়ে করতে রাজি হল। দিন ঠিক হল তিনদিন বাদ। কাছেই পরান দাঁড়িয়ে ছিল তার। পিঠে চাপড় মেরে বললো, কিরে বেটা, আমারে বাপ ভাবতে পারবি তো? ক। তয় এট্ট কতা। আমার কথা শুনে চলতি হবে।

আরে আমার বাড়ি রোজ কত লাকে খাতিছে তোরও জুটে যাবে। আটান্ন বছরের ফতেমার মুখে নির্ভর আশ্রয়ের নির্বিকার আভা ফুটে উঠলো কিন্তু হাহাকার করে উঠল পরানের প্রাণ। পরানের জীবন পাগল অন্ধকার। বাবা গেল। স্বজন, বন্ধু সব হারিয়ে মায়ের কোলটা ছিল আজম, তাও পর হয়ে গেল। মাঠের পারে শেষ বেলায়, এক বুক কান্না উজাড় করে কেঁদেছিল। নিকের পর ওর মায়ের গরুর গাড়িটা যখন ওর সামনে দিয়ে ঘাট পেরিয়ে সরু রাস্তা অতিক্রম করে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল, মা, মাগো তুই আমারে ছড়ে গেই? তুই ভালো থাকিস মা, তোরে অনেক কষ্ট গেছে আমার জন্যি, আমি আর তরে কষ্ট দেব না। আল্লায় তবে এ পৃথিবীতে আমারে কেন পাঠালি। এ তর কেমন বিচার। কয়েকদিন বাদ পরান এলো এ বাড়ি। আসার পরে একা শোয়। মাকে ছাড়া ঘুম আসে না। লুকিয়ে মা দু-একদিন গভীর রাতে ওর কাছে আসে, ও প্রত্যাশায় বসে থাকে মা আসবে। মা তার অফুরন্ত স্নেহ দিয়ে ছেলেকে বুকে আঁকড়াতে চায়, স্বামীর মনে সন্দেহ জাগে, আমার বাচ্চদের অবহেলা করছে, তারা বাবাকে নালিশ জানায় দিন রাত গুদামের কাজে পরানকে খাটায় লোকটা অপরাধ পেলেই মারে। এমনি সুখের মুখে সংসার কিন্তু ফতেমার ছেলের জন্য চোখের জল শুকোয় না। মায়ের স্বস্তির কথা ভেবে নীরবে পরান সব সয়ে যায়। ফতেমার গর্ভে সন্তান এসেছে। বড় মেয়ে এলো আঁতুর তুলতে। সে স্পষ্ট বলে দিল পরানের ভাত জল সে দেবে না। ঠিক হল এই এক মাস পরান যাবে পাথর পাড়া ওর এক মাসির কাছে। মাসির অবস্থা ভাল না পরানের সব খরচ পত্র ফতেমা দেবার অঙ্গিকার করলও পরানকে।

যত্নেই রেখেছে। সে দেশ বহুদূর। অনেক কিছু পাঠায়। ছেলেকে বুকে নিয়ে মা অনেক কেঁদে বলেছিল যা বাবা মা একটা দিন কাটিয়ে আয়, কেননা আমার আড়ালে ওরা মাকে মারবে, যেতে দেবে না। আমি মুক্ত পেলেই তোকে আনবো। আজ দুমাস এহনে আছি। মার এট্ট মাইয়া হইছে। শালা, পাজি। ''এই ছেলে, ও তো তোর বোন। বোনকে কেউ গাল দেয়?'' কেঁদে ফুঁসে উঠল পরান। ছাড়ো তো মাসি, ওই সৎ বাপবেটার মাইয়ে ও, ও আমার বুন না। যাও মার কোল ত পাচ্ছিলাম তা ও কাড়ে নিল আমারে খুব যত্নে রাহে এরাও।

মার জনা তারে কুব কষ্ট হয় না? খুব, খুব কষ্ট হয় কিন্তু একা একা যাবো। কিভাবে। মা তো থাকে সেই নেতা ধোপানী। তোকে কবে নিয়ে যাবে? ওরা শুনেছি ডাক্তার কইছে আমার নাকি ম্যাজিজটিক হতি পারে। তাই রক্ত পরীক্ষে করার পর নেবে। মা রক্ত পরীক্ষের ট্যাকা পাঠাবে শিঘ্রি। তোর জ্বরটা ভাল না ডাক্তার বলেছে? না না তুই ভাল হয়ে যাবি। সারে যাবি। ম্যানেঞ্জাইটিক হয়নি, ভয় পাস না রক্ত পরীক্ষা হলে দেখবি কিছু হয়নি মা ট্যাকা পাঠালে তো পরীক্ষা হবে। খুব জ্বর হচ্ছে। জ্বর ছাড়লে এহেনে চলে আসি সুটিং দেখতি তোমারে দেখতি এহেনে তোমারে দেখতি মনটা পাড়ে। তোমারে আমার খুব ভাল লাগে। ঠিক মার মতন। আমি তোকে টাকা দেব, মাসি কে নিয়ে দিবি। কালই শহরে গিয়ে রক্ত পরিক্ষা করে আয়, যাতে তাড়াতাড়ি মার কাছে যেতে পারিস ও

মাসি, তুমি যাবার সময়ে আমাকে নিয়ে যাবে তোমার দেশে, তোমারে ছাড়তি ইচ্ছে করে না। মাকে। ছেড়ে যাবি কেন, মা কাঁদবে তোরও তো মাকে ছেড়ে কষ্ট হবে। তা হবে। তবু যাবো। আমার জন্যি মার আর কষ্ট থাকবে না। মা তো সোয়ামী পাইছে, সংসার পাইছে, মাইয়ে পাইছে, আমি না থাকলে কয়টা দিন হয়তো কাঁদে তারপর ঠিক হয়ে যাবে। আমারে ভুলে যাবে। ঠিক আছে, আগে তুই ভাল হ আমি তোর মেসোকে বলে যাবো তোকে যাতে পাঠিয়ে দেয়। আমি তো মাসি কাজ করে খাবো। কথা শোনো। এবার আমার হত চেপে ধরলো, ও, ও মাসি আমারে নেবা তো? চমকে গেলাম ওর ব্যাকুল মুখের দিকে তাকিয়ে। শিশুর সান্ত্বনা একে দেওয়া যাবে না। আঘাতে আঘাতে ওর প্রতিটি ইন্দ্রিয় সক্রিয় জাগ্রত। দ্বিধায় পড়লাম কাকে দেবো? মুহূর্তে মনকে সক্রিয় করে বললাম হ্যাঁ তোকে আমি নিয়ে যাবো যেখানে থাকবি তাকে আশ্রম বলে। তারা তোকে পড়াবে হাতের কাজ শেখাবে, খেতে পরতে দেবে, আমি ঠিক ব্যবস্থা করে তোকে জানবো। কিরে কথা কও, নেবো, নেবো নেবো।

ওর অস্বাভাবিক চোখমুখের দিকে তাকিয়ে সন্দেহ হল। ওর কপালে উত্তাপ দেখতে গিয়ে দেখি জ্বরে ওর গা পুড়ে যাচ্ছে। অস্বাভাবিক নয়। বিকারগ্রস্তের মত করছে। ওর গায়ের উত্তাপ দেখে চারিদিকে তাকাচ্ছি দেখে একজন এগিয়ে এলো। পেন্নাম মা, ও রোজ আপনার কতা কয়। আজ আপনারে দেখলাম। অনেকক্ষণ ধরে দেখছি ও কথা কয়ে যাচ্ছে আপনের সঙ্গে।

হ্যাঁ, কদিন ও রোজে আমার কাছে আসে। না না গল্প করে। ওর কথা ওর মার কথা বলে। আজ দশ, বার দিন ধরে ওর রোজ জ্বর হয়। এহনে আসতে বারণ করি শোনে না। সব বাচ্চাগুলানের সাথে চলে আসে। এসব তো ওরা কোনদিন দ্যাহেনিদ্যাখ বে কিনা জানিনা তাই আটকাই। ওর মা নেবার জন্যি ছটপট করিতেছে। কিন্তু এই জ্বরের কথা শুনে ওর ওই বাপটা কইছে এই ছোঁয়াছে জ্বরে ওর বাচ্চাগুলানের ক্ষতি হতে পারে। আর কথা না। চল বাপ বাড়ি চল। তোর জুরের গতি ভাল না। আমি দুশোটা। টাকা লোকটির হাতে দিয়ে বলাম, কালই ওর রক্তটা পরীক্ষা করিয়ে নাও। পরান। ঘুরে দাঁড়াল ও মাসি, আমি ভাল গান জানি; যাত্রা জানি; আমারা। বাবা আমকে শিখাইছে ও মাসি, তুম তো আমার গাই শুনলে না, এহন তোমারে গান শোনো নো?

ওরে আজ থাক কাল শুনবো। সারে গান না শুনে আমি যাবি না। এখন তোর কষ্ট হবে। না না কষ্ট হবে না তুমি শোন আমি গাই জ্বরের ঘোরে আবেগ ভরা কষ্টে চোখ বন্ধ করে ও গান গাইল। বাঃ বাঃ কি সুন্দর গলা তারে, এ কদিন শোনাসনি কেন? গানটা দুঃখের, বলে ওর মেসোর দিকে তাকালাম। ও গর্ব করে বলো, আমার বাপজান শেখাইছে, আবজানের গলা আরো ভালো ছিল। ও মাসি, মাসি গো - আয় একটা গান শুনবা, ওড) আর ও ভালো। শোননা এডা। খুব মজার। এই গানডা আমার বাবা কাঁইয়ে মানুষ সার্ভে করতো, বলে হেসে গড়িয়ে পড়লো। বুঝলাম জ্বরের ঘোরে এও এক রকম প্রলাপ। এ গানের মর্ম ছেলে মার কাছে খাবার চাইছে। ডাকছে মাকে কিন্তু খাদ্যের জোগাড় করতে না পেরে মা কেঁদে কেঁদে একথা বলছে। মাসি ও মাসি গো এই গান দুটো আমার আর আমার মায়ের জীবনের মতন না? কও? হ্যাঁরে ঠিক তাই, এবার বাড়ি যা। তোমারে ছারি মন চায় না মানে কয় তোমারে আর দেখতে পাব না। না, পরে দিন ও আর এলো না। বুকটা ঢিপঢিপ করে উঠলো। টানা টানা চোখ, কোঁকরা চুল, সুন্দর মুখের মিষ্টি ছেলেটাকে ওই কদিনেই ভালোবেসে ফেলেছিলাম। মেলা পড়ে এলাও ক্লান্ত সূর্যের বুকে খন্ড খন্ড মেঘের আনাগানো। শন শন করে পড়ন্ত বেলায় মিষ্টি হাওয়ার শব্দ বয়ে যাচ্ছে গাছে গাছে। যেন নূপুরের শব্দ। ছলাৎ ছলাৎ করে পাড়ের বুকে ধাক্কা দিচ্ছে পথের নদীর জল। জোয়ার আসছে। ব্যস্ততায় ছুটে চলেছে ঘোলা লবনাক্ত জলের স্রোত। এখানকার দৃশ্য গ্রহনের শুটিং পর্ব শেষ হল। বাকিটা হবে কলকাতায়। বিদায় সুন্দরবন। বিদায় পরান - আর কখনো এখানে আসবো না। কাল ভোরেই আমাদের যাত্রা। দীর্ঘ ঘরছাড়া দিনকটার সব ক্লান্তির অবসানে ফিরে যাব আপন ঘরে। পরের দিন কলকাতা ফিরে এলাম অসুস্থ নাতনিকে নিয়ে। আট দিন একটানা ঝড়ে, জঙ্গলে, নদীর পাড়ে, হাঁস-মুরগী, ছাগলছানার কোলে জীবনের বিপরীতধর্মী জীবন যাপনে রাতেই নাতনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিল জ্বর আর অফুরন্ত বমিতে। ওকে নিয়ে

কদিন ব্যস্ত ছিলাম। ফিরে এসে। তাপর কর্মব্যস্ততায় ভেসে যাচ্ছিল পরানের স্মৃতি মানুষ অবস্থার দাস। স্থান কাল মানুষকে অনেক শেখায় অনেক ভাবায়। তাছাড়া নুতন অভিজ্ঞতা শিখেয়ে দিয়েছি, সেটাই এখন প্রধান আলোচ্য। পুরো অনুষ্ঠানটির। ভিডিও করে এনেছি, সেটাও সবার কাছে পরম কৌতুহলের বিষয়। মেয়ের মুখের ওই ভাষা প্রয়োগের নিঁখুত প্রকাশ ও পাত্র পরিবেশ পরিস্থিতি যে আবেগ বা অনুভুতির জন্ম দেয় তা হয়তো শরতের মেঘ - আকাশের ভিজে বুকে ভেসে ওঠা রামধনু উদয় হয়েই বিলীন যায়। পরানের ক্রমশঃ হারিয়ে যাওয়া স্মৃতির ওড়না খানা সরিয়ে হঠাৎ একদিন একখানা চিঠি এলো। প্রাণমান্তে সেবকের শতকোটি নিবেদন, মা, পরানের জন্য আর জায়গা ঠিক করিবার দরকার নাই তাহার সর্বদুঃখ ঘুচিয়া তাহাকে নিরাপদ জায়গা খুঁজিয়া দিয়াছে। আপনি বলিয়ছিলেন, যেখানে উহকে রাখিবেন তাহারা উহাকে মারবে না, কাজ করাইবে না, খাওয়া বা বাসস্থানের জন্য ভাবিতে হইবে না - পরান ঠিক সেই স্থানেই গিয়াছে। মায়ের মুখ ও আর দেখতে পায় নাই। উহার জ্বরটা খারাপই ছিল। আপনার উদ্দেশ্য তিনসত্যি করার দাবি জানাইত। জানিতাম মৃত্যু। উহার শিয়রে। আপনাকে ওর মৃত্যু সংবাদ জানানোর কারণ পরানের অতৃপ্ত আত্মা মহাশূন্যে ঘুরিয়েও আপনাকে খুঁজিতেছে। এই সময়ে তার অন্তিম ইচ্ছা আপনাকে জানানো দরকার কারন ''উহার মাসি উহাকে মুক্তির স্বপ্ন দেখাইয়াছে; সেও উহাকে লইবেই বলিয়া উহাকে স্পর্শ করিয়া দিব্যি কাটাইয়াছে'' মনে তার অগাধ বিশ্বাস মহাশূন্যে ঘুরিতেছে, এই অবোধের সহস্র প্রণাম লিবেন।। -বিনীত রহমৎ আলি খান।

দেহের সমস্ত শিরা উপশিরা প্রবল বেগে কেঁপে উঠল। শিথিল হাতে স্পর্শ থেকে চিঠি খানি উড়তে উড়তে সোফার তলায় আশ্রয় নিল। ডুবন্ত সূর্যের নিস্তাপ রশ্মি ধীরে পদক্ষেপে যেন পালিয়ে যেতে চাইছে পরান অধ্যায় নিস্কৃতির ডানায় ভর করে টুপ করে মিলিয়ে যেতে চাইছে মহাশূন্যের বুকের গভীর গহন অন্ধকারে - আমার দুচোখ ভাষা অশ্রুধারা যেন পরম আশীর্বাদ - যা বাবা, যা তোর নিষ্কৃতি ঘটল ততো তোর একার নয়। তোর মা। মায়ের ও মুক্তি ঘটল। মাসিরও কি মুক্তি বা নিষ্কৃতি হল না? ভালো থাকিস বাবা -

---

"সব ছেড়ে আমাদের মন
ধরা দিতো যদি এই স্বপনের হাতে!
পৃথিবীর রাত আর দিনের আঘাতে
বেদনা পেত না তবে কেউ আর,
থাকত না হৃদয়ের জরা,—
সবাই স্বপ্নের হাতে দিতো যদি ধরা!''...

—জীবনানন্দ দাশ

ছকে বাঁধা

পূর্ণিমা সেন
এফই- ৩৩৩

সক্কালবেলা থেকে বাড়িময় ঘুরঘুর করছে প্রতীক, প্রজ্ঞা, শতরূপা, দেবদীপ, অনিন্দিতা, অনিরুদ্ধ, অনিন্দ্য, অভিজিৎ, জয়তি আর ঈশিতা। তোষকের তলায়, আলমারির মাথায়, বইয়ের শেলফ্, টেবিলের ড্রয়ার, ফুলদানি, বাড়ির সব ক'টা ঘরের আনাচ কানাচ তন্ন তন্ন করে খুঁজে যেন 'ট্রেজার হান্ট' খেলছে ওরা। থেকে থেকে আবার নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ করছে। বেশ মায়া হচ্ছে সুকন্যার বেচারীদের জন্য; কিন্তু উপায় নেই বাজি তো বাজিই।

ব্যাপারটা হচ্ছে, সুকন্যা তাঁর সেই বিখ্যাত সবজির আচার আর সজনে ডাটার আচার তালা বন্ধ করে রান্নাঘরের কাঁচের দরজাওলা আলমারিতে তুলে রেখেছেন। এবার তিনি টিপে বন্ধ করা আর চাবি দিয়ে খোলার মাস্টার বা টাইগার তালার বদলে চাবি দিয়ে খোলা বন্ধ করার একটা বেশ শক্তপোক্ত তালা আলমারিতে লাগিয়েছেন। রান্নাবান্না আর নানা রকম খাবার তৈরি করার শখ তাঁর। পাঞ্জাবি বন্ধুদের শীতের সবজি, ফুলকপি, গাজর, মুলো, শালগম আর কড়াইশুঁটির মিক্সড্ আচার, কালো গাজরের কাঞ্জি, কাবুলিছোলার আচার তো আছেই। আর আছে আর নিজের আবিষ্কার এঁচোড়ের আর সজনেডাঁটার আচার। আচারটা তার ভাগ্নী জয়তীর এতোটাই প্রিয় যে প্রথমবারে খেয়ে ও বলেছিল এটা আবিষ্কারের জন্য সুকন্যার নোবেল প্রাইজ পাওয়া উচিত।

ছুটিতে আগরতলা থেকে অনিন্দ্য, অভিজিৎ, জয়তী কানপুর থেকে শতরূপা, চিত্তরঞ্জন থেকে দেবদীপ, দিল্লি থেকে ঈশিতা, ডিমাপুর থেকে অনিন্দিতা, অনিরুদ্ধ এসে গেছে। বাকি রয়েছে শুধু গুয়াহাটি থেকে গার্গী, সন্দীপ আর শিলং থেকে দোলা। বিকেলে এরা তিনজন এসে পৌঁছলেই যাকে বলে এক্কেবারে নরক গুলজার; কিন্তু বাকিদের যে আর তর সইছে না।

বারবার ওদের তাগাদায় নাজেহাল হয়ে সুকন্যা শর্ত রেখেছেন। ওরা যদি নিজে থেকেই চাবি খুঁজে বের করতে পারে, তবে সময়ের আগেই আচার খেতে পাবে তাই এই গণ-অনুসন্ধান ওদের। খুব আশা করেছিল, সুকন্যার ভুলো মনের সুযোগে অতি সহজেই চাবিটা ওরা খুঁজে পাবে। সুকন্যা ছেলে প্রতীকের তো কোন সন্দেহই ছিল না কি ব্যাপারে। লুকোনো বা হারানো জিনিস খুঁজে বের করতে ওর কোন জুড়ি নেই।

সুকন্যা বেচারী সেই কোন ছোটবেলায় শেখা ছড়া, কবিতা, কবেকার শেখা ইতিহাসের পড়া, সন তারিখ গর গর করে বলে দিতে পারেন, কিন্তু চাবির গোছাটা কোথায় রেখেছেন টাকা পয়সা কোথায় কখন গুঁজে রাখেন, গলার হারটা বালিশের তলায় না ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে রেখেছেন, কোন জিনিসের দাম কত এসব মনে করার বেলায় তার মন একেবারে যাকে বলে 'কোরা কাগজ'।

এ নিয়ে কম নাকাল করে তাঁকে তার বাড়ির লোকেরা? এই তো, গরমের ছুটিতে 'কল্পতরু' হয়ে তার পতিদেবটি আইসক্রিম পার্টি দিয়ে বসলেন। তাকে আবার ঘটা করে সবাই ধন্যবাদ দিল ফিনান্স করার জন্য। আসলে, গল্প বই পড়তে পড়তে কবে যেন সুকন্যা বইয়ের ভেতর একখানা ১০০ টাকার নোট গুঁজে রেখেছিলেন। কর্তার হাত পড়তেই এই আইসক্রিম পার্টি। প্রতীক, প্রজ্ঞার তো কথাই নেই। ওদের ভয় তিনি কাজু, কিসমিস, গরম মসলা লুকিয়ে রেখে যথারীতি নিজেই ভুলে যান। সময় মতো সেগুলো খুঁজে বের করে দিয়ে ভাই বোন মিটিমিটি হাসে। মনে রাখার জন্য সুকন্যা কতবার রুমালে গিঁট বেঁধে রেখেছেন কিন্তু মিস্টার টুহডলের মত নিজেই ভুলে যান গিঁটটা কেন বেঁধে রেখেছিলেন।

তার শব্দছক সমাধান করার নেশা নিয়েও

কি সবাই কম পেছনে লাগে তাঁর, বিশেষত তাঁর পতিপরম গুরুটি? মাঝে মাঝে রীতিমতো বিদ্রোহ করে বসেন তিনি। সকালবেলা রোজ রোজ সুকন্যার শব্দছক সমাধানের পর বাসি লুচির মতো মিয়ানো কাগজ পড়তে তাঁর ঘোরতর আপত্তি।

নিজের ভুলোমনের ভয়ে সুকন্যা চাবিটা দিয়ে রেখেছেন তার ছোট বোনের কাছে। সকালে শব্দছক সমাধান করতে গিয়েই হঠাৎ ছোটদের জব্দ করার বুদ্ধিটা এসে গেল। ওই যে বলে 'দিমাগ কা বাত্তি জ্বল গিয়া'। দেখাই যাক্ শব্দের সূত্র ধরে চাবি রহস্যের সমাধান করতে পারে কিনা ওরা। বালখিল্য পার্টি আজ রীতিমতো শর্ত মেনে চাবি খুঁজছে। অন্য কোনো উপায়ে তালা খোলার চেষ্টা করেনি। যে কোনো সাধারণ তালা খোলায় অভিজিৎ 'জিমি ভ্যালেন্টাইন' এর সমকক্ষ। একটা চুলের ক্লিপ বা কাঁটা দিয়ে মা আর দিদার মিটসেফের তালা খুলে আচারের বয়াম সাফ করা ওর কাছে জলভাত।

ইতিমধ্যেই দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর বিকেলের চায়ের আসর বসেছে। প্রতীক মুখ কাঁচুমাঁচু করে বলে, ''মা-জননী, এবার সত্যি বলে দাও চাবিটা কোথায়।' প্রতীক সত্যিই সুকন্যা কে 'মা-জননী' বলে ডাকে। আসলে, কলকাতা এসে প্রথম ভর্তি হবার পর ছোট ক্লাসে পড়ার সময় প্রতীক দুর্গাপুজোর সম্বন্ধে রচনা লিখেছিল, ''দুর্গা ভগবান সিংহের উপর দাঁড়িয়ে দশ হাতে হাতিয়ার নিয়ে খতরনাক অসুরের সঙ্গে লড়াই করছেন।'' ছেলের বাংলা দেখে সুকন্যার আক্কেল গুড়ুম! ওকে বাংলা শেখানোর জন্য আদা জল খেয়ে লাগার ফলশ্রুতি এই 'মা-জননী'। আক্ষেপ নেই সুকন্যার। তাঁর ছেলেমেয়ে দুজনেই এত ভালো বাংলা শিখেছে যে অনেক মায়েদের মতো তাঁকে ''আমার ছেলেমেয়ে বাংলাটা ভালো জানে না বলে ওদের তথাকথিত মেধার প্রমাণ দিতে হয় না।''

আপাততঃ বাচ্চাপার্টিকে সামাল দেবার জন্য সুকন্যা বলেন, ''আচ্ছা ঠিক আছে, আজকের কাগজে শব্দছকের ৬ নম্বর পাশাপাশি সুত্রটা দেখ।'' অনিন্দিতা পড়ে, ''ছিনু মোরা সুলোচনে গোদাবরী তীরে''। গার্গী বলে, ''এটা তো লিখেছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত।'' অনিরুদ্ধ বলে, ''তার মানে মধুদা চাবির খোঁজ জানে।'' শতরূপা বলে, ''জেঠুর গাড়ি চালায় তো মধুদা।'' দেবদীপ বলে, ''ধ্যাৎ মধু দা থাকে শিলিগুড়িতে। ওখানে বসে সে চাবির কথা কি করে জানবে?'' অনিন্দ্য খুব ভালো ছাত্র। অধিকাংশ সময় সে সোজা জিনিসকে কঠিন করে দেখে। সে বলে, ''হুঁ বুঝেছি এবার। মধুসূদন হচ্ছে কৃষ্ণ; তার মানে চাবির খোঁজ জানে কেষ্ট মামা।'' হেসে কুটিপাটি ঈশিতা বলে, ''কেষ্ট মামা তো গুয়াহাটিতে দাদুর বাড়ির সিকিউরিটি ম্যান। ওখানে বসে চাবির খোঁজ দেবে কি করে?'' প্রজ্ঞা বেশ ধীরস্থির মেয়ে। ও বলে, ''সমাধানটা আছে সুলোচনাতে। তাই না মা-জননী'' মিটিমিটি হাসেন সুকন্যা। সমাধানের কাছাকাছি এসে গেছে ওরা। প্রজ্ঞার কথার পিঠে অভিজিৎ বলে, ''সেটা কি করে সম্ভব? এ বাড়িতে সুলোচনা কে বা কোথায়?'' সুকন্যা বলেন, ''সুত্র দিয়ে দিলাম তো; ভাবো আরেকটুখানি। আচার খেতে চাও তো চাবি রহস্যের সমাধান করো।''

এতক্ষণে রীতিমতো হাল ছেড়ে দিয়েছে দশাবতার থুড়ি দশমূর্তি। জয়তি বলে, ''সত্যি আমাদের ঘিলু পেঁচিয়ে গেছে গো মামী। প্লিজ উত্তরটা বলে দাও। আচার আমরা এখন খাব না। আমাদের টিম পুরো হলে তবেই খাব।'' সুকন্যা বলেন, ''তোমাদের সবাই কি এটাই বলছ?'' ওরা কোরাসে বলে, ''হ্যাঁ হ্যাঁ তাই।''

সুনেত্রা কে সুকন্যা বলেন, ''চাবিটা দিয়ে দে এবার।'' প্রতীক বলে, ''ইস কি বোকা রে আমরা! সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ তোমাকে মা-জননী। সুলোচনা মানেই তো সুনেত্রা। তোমার সুত্র ধরে শুধু ছকে বাঁধা নয় ছকেই বাধা। এটা আমরা কাটিয়ে উঠতেই পারলাম না। আমরা একেবারে ক্লিন বোল্ড হয়ে গেলাম রে দাদা।'' প্রজ্ঞা ফুট কাটে, ''মা-জননীর শব্দছক সমাধান করার গুণ দেখলি তো এবার? আমরা সদল বলে শুধু শব্দজব্দ নই পুরোপুরি শব্দস্তব্ধ!''

রাণুর চিঠি

কৃষ্ণা ভট্টাচার্য
এফই- ৪৩৪

প্রিয় দাদা,

তুই বিদেশ যাওয়ার পর এই প্রথম তোকে চিঠি লিখছি। আসলে প্রতি সপ্তাহে ভিডিও কলে দেখা আর কথা তো হয়েই যায়, কিন্তু কি যেনো বলা হলো না, এমনি মনে হয়। কাছে যখন ছিলি, তখন সব কথাই বলতাম, কতো হাসতাম বিনা কারণেই। এখন অনেক দরকারী কথা মনে হয় একান্তই অদরকারী।

কখনো বসে বসে ছোটবেলার কথা ভাবি। পড়াশোনা-য় কতো ভালো ছিলি তুই। আমি তো সাধারণ। কিন্তু বাবা-মা তোর জন্য খুব গর্বিত হতো। স্বপ্ন দেখতো তুই অনেক বড়ো হবি। সত্যি সত্যি তুই চাকরীতে কতো উন্নতি করলি, বিদেশেও চলে গেলি। পরে বাবা-মা খুব দুঃখ করতেন, বলতেন আরেকটু কম পড়াশোনা করলে আমাদের ছেড়ে এতো দূরে চলে যেতো না। ছোটকাকু, কাকিমা যখন সন্তুদা, বৌদি আর বাচ্চাদের নিয়ে আসতেন, তখন মনে হোতো হয়তো।

তুই হয়তো ভাবছিস এসব বলার জন্য তোকে চিঠি লিখছি। না রে আজ বাইরে খুব দুর্যোগ, পাগল করা ঝড়বৃষ্টি। তাই মনটা খুব খারাপ লাগছে। তোদের কথা মনে পড়ছে, বৌদির সাথে রোজ রাত্রে কথা হয় তাও। তোদের, টুকুন সোনাকে কতদিন দেখিনি, এই বৃষ্টির দিনে মা কি সুন্দর খিচুড়ী বানাতো, আমিও বানাই কিন্তু সেই স্বাদ আর খুঁজে পাই না।

তোর ছোটবেলার কথা মনে আছে দাদা? সেই আমাদের পুরোনো বাড়ীটার পাশে চম্পা পিসির বাড়ী আর বড়ো আমগাছ, আমাদের কতো স্মৃতি আমগাছটা নিয়ে। দুপুরবেলা সবাই ঘুমিয়ে পড়লে সন্তুদা, মিলিদি আর আমরা আম পেড়ে সেখানে ফাটিয়ে নুন, লংকা দিয়ে খেতাম। খুব আস্তে করে ডালটা টেনে আনতাম কিন্তু চম্পা পিসি ঠিক বুঝতে পারতো, কি রাগটাই না করতো, মা শুনলে বকা দিতেন।

এখন পুরোনো বাড়ীটা ভেঙ্গে প্রমোটার নিয়ে বড়ো নার্সিংহোম করেছে। সেই আমগাছও নেই, সব অতীত হয়ে গেছে। বারবার আজ পুরোনো দিনে ফিরে যাচ্ছি, সেই দিনগুলো চিরকালের জন্য হারিয়ে গেছে, আর ফিরে আসবে না কোনোদিন।

অনেকেই জীবনে অনেক কিছু হারায়, আমার কিছু মধুর সময় হারিয়ে গেছে, যা তুই একমাত্র জানিস।

আমি এখন প্রতিভা বসু'র 'জীবনের জলছবি' বইটা পড়ছি। কি অপূর্ব! তুই এলে পড়িস।

আমরা ভালো আছি। মাঝে মাঝে বাবার বানানো 'সোনার তরী'তে ছোট কাকুদের কাছে যাই। দোতলাটা কাকিমা আমাদের জন্য খুব যত্ন করে সাজিয়ে রেখেছে। আমার তো থাকা হয় না, ঘুরে আসি। তোরা এলে থাকবি, এই অপেক্ষায় থাকি।

অনেক আজেবাজে কথা লিখে ফেললাম। তোর চিঠি-র অপেক্ষায় থাকবো। তোদের আসার আশায় আছি। আয় ভাই তাড়াতাড়ি।

—তোর ছোট বোন রাণু।

আপেক্ষিক অপেক্ষা

দেবপ্রিয়া চক্রবর্তী
এফই- ৫০৭/৮

আমি প্রেম। আমাকে নিয়ে সমগ্র মানবজাতির ভালোলাগা, ভালোবাসা, হতাশা, অভিমান, হিংসে, রাগ, দুঃখের আনাগানো।

আজ আমি আমার গল্প শোনাবো। বয়েস যে আমারো বাড়ে তোমরা বুঝতেই চাও না, তাই আমাকে নানা নাম দাও-কখনো 'মোহ', কখনো 'প্রেম', কখনো 'ভালোলাগা' আবার কখনো। 'ভালোবাসা'।

আমি যখন সবে কিশোর তখন প্রথম বাসা বাঁধি ক্লাস এইটে পড়া বন্যা আর ইলেভেনের আকাশের হৃদয়ে। বন্যার স্কুল ছাড়া স্বাধীনভাবে একা বাইরে যাওয়া শুরু হয় ওর অঙ্কের কোচিং ক্লাস থেকে, ক্লাস শেষ হতেই ওই কোচিংয়ে ইলেভেন এর পড়াশুনো শুরু হতো। বন্যা আর

আকাশের প্রথম দেখা সেখানেই। সেই সুযোগেই আমার প্রবেশ।

একটি batchশুরু ও শেষের মাঝে বন্যা খেয়াল করতো ছেলেটি যেন ভিড়ের মাঝে তাকেই খোঁজে। বন্যার ও বিষয়টা মন্দ লাগতো না বরং ভালো লাগতো এটি ভেবে যে সেও কারোর কাছে বিশেষ হয়ে উঠছে।

বন্যা ও আকাশের কাছে আমি ছিলাম-'এক ঝলক দেখতে পাওয়া বা ভিড়ের মাঝে চোখের ভাষায় বাক্যবিনিময়।' আমার উপস্থিতির অনুভব ঠিক সেই মুহূর্ত থেকে করতে পেরেছিলো ওরা।

একদিন হঠাৎ বন্যা কোনো অজানা কারণে কোচিংয়ে আসা বন্ধ করে দিলো। আকাশের কাছে বন্যার নাম ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। মন ভেঙে গেলো ওর। মাঝে মাঝে আকাশের খুব। কান্না পেতো, মন বসতো না পড়াশুনোতেও, দেখতে দেখতে আকাশের হৃদয়ে আমার জায়গা নিয়ে নিলো রাগ।

আকাশ ঠিক করলো কোনাদিন সে আর কাউকে ভালাবোসবে না। কিন্তু, হায় কপাল! মানবজাতি, তোমার ইচ্ছের ওপর যে আমার আসা যাওয়া নির্ভরশীল নয়।

এখন আকাশ Accountency Hons– City কলেজ। পড়াশুনো ছাড়া পাড়ার মোড়ে সিগারেটের ধোঁয়া ওড়াতে ওড়াতে রাজনীতি, খেলা নিয়ে গুটিকতক বন্ধুর সাথে আড্ডা আর বাড়িতে অবসর সময়ে Social Mediaই হলো তার দিনযাপন।

ও নতুন সম্পর্ক তৈরি করতে ভয় পেতো, তা সে যেকোনো সম্পর্কই হোক্ না কেন। পাড়ার ওই ছোটবেলার বন্ধু ছাড়া কোনো বিশেষ বন্ধু ছিলো না আকাশের। এমনকি কলেজেও সে বদরাগী বলেই পরিচিত ছিলো বেশ।

হয়তো, সম্পর্কে জড়িয়ে সম্পর্কের যন্ত্রণা পেতে ভয় পেতো আকাশ। তাই তার অবচেতন মন প্রশ্রয় দিতো তাকে আত্মকেন্দ্রিক হ'তে। আসলে আকাশ ভয় পেতে পেতে ঘেন্না করতে শুরু করেছিল আমাকে।

কিন্তু আমি বা বিনা দোষে কেন ঘেন্নার পাত্র হই বলো? তাই আমিও নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করবো বলে পণ নিলাম। বয়েস কম হওয়ায় আমারও তখন একগুঁয়েমি ষোলআনা। কোনোকিছু ঠিক করেছি যখন, শেষ না দেখা অব্দি আমি কি আর ছাড়ার পাত্র?

একদিন হঠাৎই FB এর news feed এ ঘুরতে ঘুরতে একটি লেখা চোখে পড়লো আকাশের। লেখাটা যেন তার মনেরই বহিঃপ্রকাশ। লেখাটা আকাশের মন ছোঁয়ার সাথে সাথেই আমিও সুযোগ পেয়ে গেলাম আবার নতুন করে আকাশের হৃদয়ে

জায়গা করে নিতে।

আমার প্রশ্রয়ে নিজের অজান্তেই আকাশ comment করে বসলো বৃষ্টি কে।

লিখলো-''আপনারা যা লেখেন তা কি শুধুই আপনাদের কল্পনা নাকি আপনারা যা বিশ্বাস করেন তাকেই খাতায় রূপ দেন?"

আকাশ কমেন্টটা করে ফেলে অপেক্ষা করতে থাকলো উত্তরের। আর অবাক হচ্ছিল এই ভেবে কেন সে এত অপেক্ষা করছে, অচেনা একটা মানুষের উত্তরের জন্য।

আমি তখন মনে মনে হাসছি। জেতার প্রথম স্তর পেরিয়েই মনে এক প্রশান্তি অনুভব করছি।

আকাশ ও বৃষ্টির গল্পগাথার সূচনা এখানেই। কিছুদিনের মধ্যেই আকাশ অনুভব করতে পারলো আমাকে। বৃষ্টির জন্য আকাশের যে অনুভূতি তার মধ্যে ছিল উন্মাদনা, অস্থিরতা আর অনেকটা ভালালোগা অনুভব করেও আকাশ কোথাও যেন আমার অস্তিত্ব স্বীকার করতে নারাজ। ওর মনে তখন নানান প্রশ্ন জট বাঁধছিলো। গোটা একটা দিন বন্ধ ঘরে বসে নিজেকে বোঝার জানার চেষ্টা করলো আকাশ।

প্রশ্ন করলো-''বৃষ্টির প্রতি তার এই অনুভূতির নাম কি? প্রেম! তবে বন্যা? সেই অনুভূতির নাম কি?"

অনেক ভেবে বন্যার সাথে নিজের সম্পর্কের নামকরণ করতে গিয়ে আমার নাম হলো পরিবর্তিত। অপরিণত আমি হয়ে গেলাম 'মোহ'।

পরের দিনই বৃষ্টিকে আকাশ জানালো তার মনের কথা। বৃষ্টিও তার অনুভূতিকে প্রশ্রয় দিলো। শুরু হলো প্রেম। কৈশোর পেরিয়ে আমি পৌছালাম যৌবনে।

বৃষ্টির সম্মতির পরে আকাশ ঠিক করলো যে, বন্যার যা কিছু স্মৃতি তার কাছে এত যত্নে এতদিন রাখা আছে আজই সে ফেলে দেবে। নিজেকে উজাড় করে আকাশ, শুধু হবে বৃষ্টির। যদিও থাকার মধ্যে ছিলো একটা শুকিয়ে যাওয়া গোলাপ ফেলতে গিয়ে থমকাল আকাশ, বাধা দিলাম আমি। নিজের কিশোর বেলার স্মৃতি কি করে ফেলতে দিই বলো তো?

আকাশকে বোঝালাম আকাশের জীবনের প্রথম নারী তো বন্যাই। তাই তাকে হৃদয়ের কোণে প্রথম ভালাবোসার ঘ্রাণ হয়ে সুরক্ষিত রাখতো, তাই করলো আকাশ। আরও একবার জয়ী হলাম। আমি।

বৃষ্টিতে আকাশ মগ্ন হোলো। শরীর মনের এক অদ্ভুত রসায়ন অনুভব করলো তারা। ভালোবাসা দিয়ে ভালোবাসাকে জড়িয়ে রাখার অঙ্গীকার নিলো দুজনে। স্বাধীনচেতা প্রেম নিজেদের ভালোবাসাকে অক্ষত রাখতে সবরকম প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে কোনো এক শুভলগ্নে একে অন্যের হলো সম্পূর্ণভাবে।

না মধুমাসের শুভলগ্নেই আমার গল্পের শেষ না। আকাশ বন্যার সাজানো সংসার ছিলো স্বপ্নের মতো। আর তার প্রতি কোণায় ছিলো আমার বাস। কিন্তু আমায় নিয়ে যাপন তো এত সোজা নয়, চব্বিশ ঘন্টা চার দেওয়াল বড়োই নিঠুর।

তাছাড়া তোমরাও বড়ো অদ্ভুত, যা তোমাদের কাছে থাকে না তার জন্য হাহাকার করো আর পাওয়া হয়ে গেলেই পুরোনো আসবাব এর মতো অবহেলা করতে থাকো।

আমি যে আবার একদম অবহেলা সহ্য করতে পারি না, আমি অবহেলিত হলেই সেখান থেকে সকলের অজান্তেই বিদায় নি। হঠাৎই অনুভূত হয় আমি আর কোথাও নেই।

আবার হেরে গেলাম আমি। আমি চলে যেতেই দুজনে ভুল গেলো তারা স্বতন্ত্র। নিজেদের অহংবোধ কে প্রতিষ্ঠিত করতে দুজন দুজনকে নিজের মতো করে গড়ে তোলার চেষ্টায় কখন যে 'মনে' নিতে নিতে 'মেনে' নেওয়া শুরু করলো নিজেরাই বুঝলো না।

আকাশ আত্মকেন্দ্রিক আর বৃষ্টি অভিমানী আবেগপ্রবণ। তাই দুজনেরই খারাপলাগাগুলো মনের মধ্যেই থেকে গেলো।

—বেশ কিছু বছর পরে কর্মসূত্রে দুই দিনের জন্য বৃষ্টি গেলো শান্তিনিকেতন। পুরোনো ক্যাম্পাস এ ঘুরতে ঘুরতে সৈকতের সাথে দেখা বৃষ্টির। পুরোনো

বন্ধু সৈকত এখন বিশ্বভারতীতেই পড়ায়।

পুরোনো ক্যাম্পাস, সোনাঝুড়ি, কোপাই নদীর পাড়ে বাউল গান, গল্প আডডা সব মিলিয়ে স্বপ্নের মতো কেটে যায় দুজনের। যেন কলেজ জীবনে ফিরে যায় ওরা। ফেরার দিন সৈকত ট্রেন এ তুলতে এসেছিল বৃষ্টিকে। দুজন শুধু দুজনের দিকে তাকিয়ে বলেছিলো—'ভালো থাকিস'।

কঠিন, রুক্ষ জীবনে অসময়ের এক পশলা বৃষ্টির মতোই সৈকত বৃষ্টির মণিকোঠায় জায়গা করে নিয়েছিলো। আর একবার নতুন করে ফিরে এলাম আমি। কিন্তু এখন আর আকাশ এর কাছে নয়।

আমার ধর্মই হলো বায়ুর মতো, শূন্যস্থান পূরণ করি। শূন্যস্থান তৈরি হওয়ার জন্য কিন্তু দুটো মানুষের খারাপ হওয়ার প্রয়াজেন পড়ে না। অভিমানের পরত জমতে জমতে দুটি মানুষের মাঝে।

যে অদৃশ্য দেওয়াল তৈরি হয় তাই শূন্যতা।

এখন আমি প্রাপ্তবয়স্ক, এখন আমার কোনো নাম নেই, না আছে বর্তমান না আছে ভবিষ্যৎ। আছে কেবল কিছু মুহূর্ত, সেই মুহূর্তগুলোকে মনে রেখে বাঁচার তাগিদ।

আমার এখন কিছু চাওয়া-পাওয়া নেই আছে শুধু দুজন দুজনকে ভালো থাকতে দেওয়ার অঙ্গীকার।

আকাশ বৃষ্টি এখন ষাট ছুঁই ছুঁই। দুজন দুজনকে ছাড়া এক মুহূর্ত চলে না। কিন্তু তাও যেন কিছুর একটা অভাব ওদের মধ্যে বিরাজ করে।ওরা মনে মনে এখন আমার নাম দিয়েছে 'অভ্যাস'। একবিষাদ ভরা চোখে দুজন মাঝে মাঝে দুজনের দিকে তাকিয়ে থাকে। কি ভাবে ওরা?

জানিনা, আমি তো সবসময় ভালোবাসাকে ভালো রাখার চেষ্টা করেছি, দিয়েছি সজীবতা। কিন্তু মানুষ এত বিচিত্র যে যখন তাদের কাছে আর সময় থাকে না, তখন হঠাৎ তাদের কাছে সময়ের গুরুত্ব বেড়ে যায়। আসলে তোমাদের চাওয়া পাওয়া গুলোই ভীষণরকম ব্যস্তানুপাতিক। অপেক্ষা হওয়ার স্মিত হাসিটুকুই তোমাদের পছন্দ, অপেক্ষা করার বিরহবাসা ভালো লাগে না।

"এখনো শেষ হয়নি গল্পটা।
বজ্রের সঙ্গে মেঘের বিয়েটা হয়ে গেলো ঠিকই
কিন্তু পাহাড়কে সে কোনোদিন ভুলতে পারলনা।
বিশ্বাস না হয় তো চিরে দেখতে পারো
পাহাড়টার হাড়-পাঁজর,
ভিতরে থৈথৈ করছে
শত ঝর্ণার জল।''

—পূর্ণেন্দু পত্রী